স্বাধীনতার
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

প্রথম খণ্ড

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য
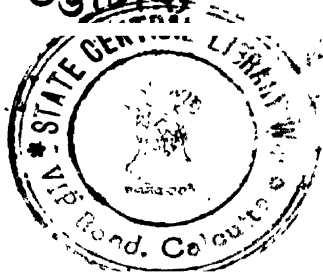
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

তিন টাকা

নিবেদন

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ডতায় ইহার আরম্ভ এবং আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের স্মরণীয় সংগ্রামে ইহার পরিসমাপ্তি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস এবং ব্যক্তিগত জীবনোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত এই ইতিহাসের পরিপূরক এক-একটি অবিচ্ছেদ্য স্তর রচনা করিয়াছে। একই প্রকারের উদ্দেশ্য ও দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা রূপায়িত এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা ইহাকে দান করিয়াছে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস অনন্যসাধারণ এবং পরম বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। স্বাধীনতা লাভের দুর্ব্বার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র সৈন্যদলই এখানে বিদ্রোহী হয় নাই—সুবৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ দলও সুদূর-প্রসারী কার্য্যকলাপের দ্বারা পরিকল্পনা করিয়াছে ভারতব্যাপী বিপ্লব-সংঘটনের। ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের সংখ্যাও এখানে বিপুল। কেহ বা জীবন দিয়াছেন ফাঁসিকাষ্ঠে—কেহ বা লাঠি অথবা বন্দুকের গুলির আঘাতে—আবার কেহ বা তিলে তিলে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিয়া। সহিংস এবং অহিংস—এই দ্বিবিধ আন্দোলনই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়াছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলা দেশে এক বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ব্যতীত ভারতের আর কোথাও সত্যকারের কোনও নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয় নাই। প্রাক্-

গান্ধী-যুগে গুপ্ত বিপ্লবান্দোলনই ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে; সুতরাং সেদিক দিয়া বিচার করিলে এই বিপ্লবান্দোলনের প্রভাব ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে তখনকার গুপ্ত বিপ্লবীদলসমূহের বা ব্যক্তিবিশেষের সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারাই দেশব্যাপী নিরুদ্ধ বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—যাহার ফলে সুদৃঢ়ভিত্তি-সম্পন্ন বৈদেশিক শাসন-শক্তি হইয়াছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং নিরুপায় ভারতবাসী হইয়াছে আপনাদের অসহায়ত্ব এবং ক্ষমতাহীনতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন। শাসকগণ ইহাকে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করিয়া ভীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—আর এ দেশের জনসাধারণ ইহাকে তাহাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসাবে বিচার করিয়া।

এই বিপ্লবান্দোলনের গতি ও ধারা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যেন এই ইতিহাস কেহ রচনা করে নাই—ইহা স্বয়ংসৃষ্ট। কোন একটি মাত্র বিশেষ দল বা ব্যক্তির সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় ইহা সৃষ্ট হয় নাই—বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সংযোগবিহীন বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন বিপ্লবীর দ্বারা এই ইতিহাস যেন আপনাকে আপনি রচনা করিয়াছে, দান করিয়াছে পূর্ণতা—ইহার ধারাবাহিকতা এবং পূর্ব্বাপরতাকে ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। একটা সুবৃহৎ দেশের নিপীড়িত জনগণের বিক্ষুব্ধ আত্মার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ইতিহাসের এক দুর্লঙ্ঘ্য অমোঘ বিধানে এই সকল মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর ঘটিয়াছে শুভ-আবির্ভাব—অসীম দুঃখ-নির্য্যাতন বরণ অথবা আত্মোৎসর্জনের দ্বারা যাঁহারা আমাদের বন্ধন-মুক্তিকে সম্ভাব্যরূপ দান করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক দিকটাকেই প্রধানতঃ রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক

আন্দোলনের যে সকল কথা না বলিলে বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমিকার সম্যক্ পরিস্ফুটন সম্ভব হয় না—যথাস্থানে তাহাও যথাসম্ভব বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা পাঠকালে এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র অতি গুপ্তভাবেই এই বিপ্লবান্দোলন পরিচালিত করা সম্ভব ছিল—এবং হইয়াছিলও তাহাই। এই কারণে এবং বিদেশী শাসকদের দ্বারা বিপ্লবী ও বিপ্লবী দলসমূহের ক্রিয়া-কলাপের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ থাকার জন্য বহু মূল্যবান ও প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যে সামান্য তথ্যাদি অবশিষ্ট ছিল—ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে বিদেশী শাসকদের দ্বারা নথি-পত্র ভস্মীকৃত হওয়ার ফলে তাহাও নষ্ট হইয়াছে; উপরন্তু বিপ্লবী বা বিপ্লবী দলসমূহের কার্য্যকলাপকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করিবার জন্য সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করিতেও তাঁহারা কসুর করেন নাই; সুতরাং বিপ্লবী ও বিপ্লবান্দোলনের নিখুঁত প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা বিদেশী-শক্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্ত্তেই সম্ভব নহে। অতএব বর্ত্তমান গ্রন্থখানিরও সর্ব্ববিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিকতা আমরা দাবী করি না এবং এইরূপ করাও ধৃষ্টতা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান গ্রন্থখানির রচনা-কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে বহু তথ্য এবং তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদেরই অনেক সময় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সে সংশয়ের মীমাংসা করিবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই এই গ্রন্থে এইরূপ কোনও ত্রুটি বা অনৈক্য দৃষ্টিগোচর হইলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহা মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করি। এইরূপ কোনও ত্রুটি থাকিয়া থাকিলে এবং তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় অবশ্যই

উহা সংশোধন করা হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা যতদূর সম্ভব সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বিপ্লবান্দোলন দমনকল্পে কার্য্যকরী ব্যবস্থাদি অবলম্বনের বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য যে রৌলট কমিটি নিযুক্ত হন, সেই কমিটিই ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনের পর্য্যালোচনা করিয়া উহার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের যে প্রয়াস পান, তাহাতেই তৎকাল পর্য্যন্ত বিপ্লবান্দোলনের একটা মোটামুটি ইতিহাস বিবৃত হইয়াছিল—ইহা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে রৌলট কমিটির অনেক সুযোগ-সুবিধাও ছিল—সরকারী এবং বে-সরকারী সূত্র হইতে সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকারের আনুকূল্যই তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং উক্ত রিপোর্টের তথ্যাদি বহুলাংশে প্রামাণিক। রৌলট কমিটির রিপোর্ট একদিক দিয়া বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকিলেও—বিপ্লবান্দোলনের একটা ইতিহাস সঙ্কলনের ব্যাপারে পরোক্ষে ইহা উপকারও করিয়া বসিয়াছে।

পরিশেষে ইহা জ্ঞাপন করা আবশ্যক যে, এই পুস্তকের "অগ্নি-যুগ" শীর্ষক অধ্যায়টি বর্ত্তমান গ্রন্থের শিরোনামা লইয়া সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশ এখনও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। ইতি—

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৫৬।

বিনীত
গ্রন্থকার

পাঠ-নির্দেশ

ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তৃতির বিবরণ ... ১

ভারতের সম্পদে বিদেশীদের লোভ—৩, ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভারত-আগমন—৪, ইংরাজ ও ফরাসীগণের স্বার্থ-সংঘাত—৭, পলাশির যুদ্ধ—নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রাণনাশ—৮, ইংরাজগণের ক্ষমতালাভ—৯।

স্বাধীনতার প্রথম মহাসমর—১৮৫৭ ... ১৭

মহাসংগ্রামের পটভূমিকা—১৯, মহাসংগ্রামের নায়কবর্গ—২২, মহাসংগ্রামের ব্যাপ্তি এবং প্রচণ্ডতা—২৫।

ওয়াহাবী আন্দোলন ও নীল বিদ্রোহ ... ৩৭

ওয়াহাবী আন্দোলন—৩৯, নীল বিদ্রোহ—৪০।

অগ্নি-যুগ ৪৭

সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজনৈতিক অবস্থা—৪৯, মহারাষ্ট্রে বিপ্লবান্দোলন—৫৩, র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট-হত্যা—৫৫, ওয়াইলী সাহেবের জীবন-নাশ—৫৯, জ্যাক্‌সন-হত্যা—৬১, বাংলায় বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত—৬১, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন—৬৪, কিংসফোর্ড-হত্যার ষড়্‌যন্ত্র—৭৪, শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী—৭৫, ক্ষুদিরাম—৭৮, মজঃফরপুরের ঘটনা—৮২, মুরারিপুকুর বাগানে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাপ্তি এবং আলিপুর বোমার মামলা—৯২, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—৯৩, কানাইলাল দত্ত—৯৬, বিশ্বাসঘাতক নরেন

গোসাই—৯৯, নন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত—১০৮, স্বদেশী ডাকাতি—১০৯, ষড়্‌যন্ত্র মামলার আধিক্য—১১৩, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবান্দোলনের প্রসার—১১৫, বঙ্গ-বিভাগ-ব্যবস্থা রদ্—১১৭, লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ—১১৮, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু—১১৯, দিল্লী ষড়্‌যন্ত্র মামলা—১২৩, গদর দল—১২৫, কোমাগাটামারু—১২৭, ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা—১২৯, লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা—১৩১, রাসবিহারীর ভারত-ত্যাগ—১৩৩, স্বাধীনতা-অর্জ্জনে বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টা—১৩৪, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)—১৩৬, রড়া কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি—১৪২, মেভারিক—১৪৫, নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জন-চিত্তপ্রিয়—১৪৭, চাষাখন্দ-এর সংগ্রাম—১৫৬, গৌহাটীর লড়াই—১৬০, রেশ্‌মী চিঠি-ষড়্‌যন্ত্র—১৬০।

ভারতে
বৃটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তৃতির বিবরণ

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতের সম্পদে বিদেশীদের লোভ

পৃথিবীর ইতিহাসের ইহা একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, যখনই যে জাতি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন—তখনই দেখা গিয়াছে যে সেই জাতির সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক কোন-না-কোন উপায়ে বর্ত্তমান। এইরূপে গ্রীক, রোমক, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে যুগে যে জাতিই পৃথিবীর ইতিহাসে সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক দিক দিয়া নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাঁহাদেরই সহিত সেই যুগে ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের উপরই এই সকল জাতির উন্নতি ও সভ্যতা পরিপূর্ণরূপে না হইলেও বহুপরিমাণে ছিল নির্ভরশীল। কাঁচামালের উৎপাদন ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যের পীঠস্থান হিসাবে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই সুনাম এবং সৌভাগ্যই পরবর্ত্তীকালে তাহার দুর্ভোগ এবং দুঃখ-কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। লুব্ধ বৈদেশিকগণের দুর্জ্জয় প্রলোভনের নিকট ভারতের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বার বার বিপন্ন হইয়া পড়ে।

ইউরোপ মহাদেশ ও অন্যান্য দেশের সহিত সুপ্রাচীন কাল হইতেই আফগানিস্থান, ইরাণ ও লোহিতসাগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্য চলিত। ভারতের সহিত এই বাণিজ্যের দ্বারাই এক সময়ে বোগদাদ্, ভেনিস ও জেনোয়া অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালক্রমে তুর্কদের দ্বারা রোমক-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষের সহিত ইতালীর বাণিজ্য-পথ তাঁহারা বন্ধ করিয়া দেন। তখন আটালান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতে থাকে। জেনোয়ার অধিবাসী কলম্বস্ ভারতে

আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিলেন আমেরিকা মহাদেশ। অবশেষে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা।

ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভারত-আগমন

পর্ত্তুগীজ নৌ-শক্তির তখন প্রবল প্রতাপ এবং জলদস্যু হিসাবেও পর্ত্তুগীজরা ছিল দুর্দ্ধর্ষ। ভারতের বাণিজ্যকে পুরাপুরি নিজেদের হস্তে রক্ষা করাই ছিল তাহাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য—আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করা। কয়েকটি জলযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহারা ভারত-সমুদ্রে নিজেদের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং কয়েকটি বন্দর দখল করে। এইভাবে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বেসিন এবং ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সল্‌সেটি তাহাদের অধিকারে যায়। বোম্বাই হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে সুবিস্তৃত ভূভাগ—তাহা কোঙ্কন নামে পরিচিত। পর্ত্তুগীজগণ এই কোঙ্কন প্রদেশে লুঠতরাজ আরম্ভ করে, বিজাপুর রাজ্যের বন্দরগুলি পুড়াইয়া দেয় এবং বিজাপুর ও আহম্মদনগরের সম্মিলিত সৈন্যবলও তাহাদের পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় না। এইভাবে পশ্চিম ভারতে তাহারা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব-ভারতে হুগ্‌লী ও চট্টগ্রাম ছিল তাহাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে হুগ্‌লীতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

পর্ত্তুগীজরা ছিল গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। হিন্দু ও মুসলমানদের উপর তাহারা ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং জলপথে তাহাদের দস্যুবৃত্তিতে ভারতীয় বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। পর্ত্তুগীজরা ক্রীতদাসের ব্যবসা চালাইত এবং অনাথ হিন্দু-মুসলমান শিশুদিগকে খৃষ্ট-

ধর্ম্মে দীক্ষা দান করিত। নানা উৎপাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজ্যের সকল পর্ত্তুগীজকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পর্ত্তুগীজদের বিরুদ্ধে ওলান্দাজদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহানও পর্ত্তুগীজগণকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কাশিম খাঁকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠান। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগ্‌লী অবরোধ করেন এবং তিন মাসের চেষ্টায় হুগ্‌লী অধিকার করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা-র আবিষ্কৃত জলপথে কেবলমাত্র পর্ত্তুগীজগণই লাভবান হইল না—অন্যান্য নানা ইউরোপীয় জাতিও একে একে ভারতে আসিয়া হাজির হইলেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ২১৮ জন ইংরাজ বণিক সম্মিলিতভাবে এক কোম্পানী গঠন করেন এবং পূর্ব্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়া ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীকে এক সনন্দ দান করেন। সাধারণভাবে এই কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। ওলান্দাজ, ডেইন এবং ফরাসীগণও একে একে নিজ নিজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন।

পর্ত্তুগীজগণ একদিকে যেমন জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিল, অপরদিকে সেই অনুপাতে ইংরাজগণ লাভ করিয়াছিলেন সম্রাটের অনুগ্রহ। জাহাঙ্গীর ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণকে সুরাটে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরের সভায় সার টমাস্ রো-কে দূত স্বরূপ পাঠান এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য কতকগুলি সুবিধা আদায় করেন। শাহ্‌জাহানের আমলে পর্ত্তুগীজরা বাংলা দেশ হইতে বিতাড়িত

হওয়ার পর ইংরাজরা হুগ্‌লীতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান এবং বার্ষিক এককালীন কিছু টাকা দিয়া বিনা শুল্কে বাংলা দেশে বাণিজ্যের অধিকারও লাভ করেন।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মিত হওয়ার পর তাহা রক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গও তৈয়ারী করা হয়। ঐ দুর্গের নাম রাখা হয় ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। বর্ত্তমানে যেখানে বোম্বাই নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে ঐ স্থানটুকু ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্ত্তুগীজ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটুকু নিজের অধীনে রাখিয়া উহার তত্ত্বাবধান করা ইংলণ্ডরাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই জন্য ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে দশ পাউণ্ড বাৎসরিক খাজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিনি উহা স্থায়ীভাবে ইজারা দেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর গোড়া পত্তন করেন কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক সাহেব। কলিকাতায় জমিদারি-স্বত্ব লাভ করিয়া ইংরাজগণ ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুযায়ী উহার নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম।

এইরূপে মাত্র একশত বৎসরের মধ্যেই ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রান্তে ইংরাজগণের তিনটি শক্তিশালী বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোম্পানীর সঙ্কট ঘনীভূত হইল। অন্যান্য স্বদেশীয় বাণিজ্য-লোলুপ প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব হইয়া উঠিল বিপন্ন। যাহা হউক, পরিশেষে অপর একটি প্রবল প্রতিযোগী কোম্পানীর সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং সম্মিলিত নব-গঠিত কোম্পানীর নাম হয় "ইউনাইটেড্‌ কোম্পানী"।

ইংরাজ ও ফরাসীগণের স্বার্থ-সংঘাত

ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণকে কিন্তু শীঘ্রই ফরাসীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইল। ফরাসীরা ইতিমধ্যে পণ্ডিচারী, চন্দননগর, মাহে প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজদিগকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ তখনকার দিনে ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলেই ভারতবর্ষেও তুইটি দেশের বাণিজ্য-কোম্পানীর মধ্যে যথারীতি যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং সমগ্র দেশব্যাপী ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই অরাজক অবস্থার মধ্যে নব-গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকল নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত হইল। বৈদেশিক বাণিজ্য-কোম্পানীগুলির অন্যায় আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টাকে সংযত করিবার মত কোনও শক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না; সুতরাং ইংরাজ ও ফরাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির বিবাদে নিজেদের মনোমত পক্ষ অবলম্বন করিয়া অবাধে সুবিধা আদায়ের ও বিরুদ্ধ শক্তিকে বিনাশের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

এইভাবে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে। ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা কর্ণাটযুদ্ধগুলির প্রথম দিকটায় সাফল্যলাভ করিতে থাকিলেও শেষের দিকে কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ-পরিচালিত ইংরাজদের নিকট তাঁহাদিগকে হটিয়া যাইতে হইল। ডুপ্লের পরবর্ত্তী ফরাসী গভর্ণর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইল।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠালাভের মূল কেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ-কে পদচ্যুত করিয়া বিহারের সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁ বাংলার নবাব হইয়া স্বাধীন নৃপতির ন্যায় রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে নবাব হইলেন। শীঘ্রই ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরাজগণের কাশিমবাজারের কুঠি দখল করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলে কলিকাতার অধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্লাইভ এবং ওয়াট্‌সন তখন মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুনরায় দখল করিলেন। ইহার পর আরম্ভ হয় চন্দননগরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের অভিযান এবং এই ব্যাপারে সিরাজদ্দৌলার আপত্তি অগ্রাহ্য করা হয়। অবশেষে চন্দননগরও ইংরাজদের হস্তগত হইল।

পলাশির যুদ্ধ—নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রাণনাশ

নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র এই সময়ে ব্যাপক এবং গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজদের সাহায্যে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য নবাবের মন্ত্রিগণ এক ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন এবং তাহারই ফলে ক্লাইভ হাজার তিনেক সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অভিযান করিলেন। ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশি-প্রান্তরে নবাবের প্রায় সত্তর হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিত সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। সেনাপতি মীরজাফর ও অন্যান্যের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধটি হইল নামে মাত্রই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুনের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে বিপুল সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

পরাজিত হইয়া নবাব পলায়ন করিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে ধৃত করিয়া হত্যা করা হইল।

ইহার পর মীরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু কর্তৃত্ব পাইলেন না। স্বাধীন নবাবের শেষ মর্য্যাদা সিরাজদ্দৌলার সহিতই সমাধিস্থ হইল। ইংরাজগণ ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে লাগিলেন। চব্বিশ পরগণার জমিদারি মীরজাফর ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে এবং লুব্ধ কর্ম্মচারিগণের দাবী সম্পূর্ণ মিটাইতে না পারার জন্য ইংরাজরা ঐ সালেই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে বাংলার নবাব করিলেন। মীরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজদিগকে প্রদান করেন।

মীরকাসিম ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা পুরুষ—তাই নানা ব্যাপারে ইংরাজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থায়ী হইল না ; ফলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। নবাব পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার সাহায্যে পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু বক্সারের যুদ্ধেও মীরকাসিমকে পরাজয় বরণ করিতে হইল। মীরকাসিমের সহিত বিবাদ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজগণ পুনরায় মীরজাফরকে নবাব করেন এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ প্রদান করা হয়। এই সময় ক্লাইভ পুনরায় গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

ইংরাজগণের ক্ষমতালাভ

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ ইংরাজদের ক্ষমতালাভের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এই বিজয়ের দ্বারাই তাঁহারা ভবিষ্যৎ

ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই ইংরাজগণ ক্ষমতা লাভ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের খেয়াল-খুসি মত নবাবকে সিংহাসনে বসাইতে, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে এবং তাঁহাকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত যে ইংরাজ-গণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য, এই সময় হইতে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও অধিকারী হইতে আরম্ভ করেন।

নাজিমউদ্দোলাকে ইংরাজরা সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন। মাত্র পদমর্য্যাদা রক্ষার অতিরিক্ত সৈন্য রাখার ক্ষমতা নবাবের রহিল না। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইংরাজগণ কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাই নবাবের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করিয়া দিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর তৎকালীন শক্তিহীন মুঘল-সম্রাট্ বাংলার নামতঃ প্রভু দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব-আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত "উত্তর সরকার"-নামীয় জিলাগুলির অধিকার ইংরাজরা লাভ করিলেন। বাংলার নবাবের সহিত চুক্তি অনুযায়ী তাঁহারা হস্তগত করিলেন বাংলার শাসন-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব। ক্ষমতাহীন বাংলার নবাবের জন্য ইংরাজরা বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এক সময়ের স্বাধীন নবাব এইরূপে বৃত্তিভোগী নবাবে রূপান্তরিত হইলেন।

নবাব ও কোম্পানীর এই দ্বৈত-শাসনের যুগে দেশে অতিশয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বাংলায় রেজা খাঁ এবং বিহারে শিতাব রায় কোম্পানীর তরফে দেওয়ানার কাজ করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে জনসাধারণের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে (বাংলা ১১৭৬ সালের "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর") বাংলা

দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাংলায় গভর্ণর হইয়া আসিয়া অনেকটা শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। হেষ্টিংস দিল্লীর সম্রাটের ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বাংলার নবাবেরও বাৎসরিক বৃত্তি কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিলেন।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট এই সময় হইতে কোম্পানীর কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন পাশ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এইভাবে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থের নিয়ামক আইন এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারত-আইন পাশ হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সখ্য স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিয়া টিপুকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে টিপুকে অর্দ্ধেক রাজ্য হারাইতে হইল। টিপুর নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজ্যার্দ্ধ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠারা ভাগ করিয়া লইলেন। ইংরাজগণের অংশে পড়িল কুর্গ, বড়মহল, মালাবার, দিন্দিগাল ইত্যাদি স্থান।

সার্ জন শোর সাদাৎ আলি খাঁ-কে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া এলাহাবাদ হস্তগত করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড ওয়েলেস্‌লি। তিনি আসিয়া "অধীনতামূলক মিত্রতা" নীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। এই নীতি অনুযায়ী ভারতীয় রাজন্যবর্গকে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজের শরণ লইতে আহ্বান জানান হইত এবং তাহার বিনিময়ে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার আশ্বাস দিতেন। যিনি "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ

করিতেন, তাঁহার আর অপর বৈদেশিক শক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার অধিকার থাকিত না। উক্ত মিত্রতা-স্থাপনকারী রাজাকে নিজ ব্যয়ে একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ করিতে হইত অথবা ঐ সৈন্যদল রাখিবার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে খরচ যোগাইতে হইত।

এই মিত্রতা যিনি সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করিলেন, তিনি হইলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। টিপু এই মিত্রতা স্বীকারে সম্মত হইলেন না, তাই মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। টিপু যুদ্ধে নিহত হইলেন। টিপুর পিতা হায়দার আলি যে হিন্দু-রাজবংশের হস্ত হইতে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূর কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মহীশূর রাজ্যের কতকাংশ সেই রাজবংশের হস্তেই পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল—কতকাংশ দখল করিয়া লইলেন ইংরাজগণ ও নিজাম। মহীশূরের হিন্দু রাজা ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণের ফলে নিজামকে যে বৃটিশ সৈন্যদল রাখিতে হইয়াছিল, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহীশূর রাজ্য হইতে প্রাপ্ত ভূখণ্ড নিজাম শীঘ্রই ইংরাজগণকে অর্পণ করিলেন।

রাজ্য অধিকার করাই ছিল ওয়েলেস্‌লির মূল নীতি। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর এবং সুরাট ও ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করা হইল। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে তিনি রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপুর প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ওলান্দাজ-অধিকৃত বহু স্থানও তিনি বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মারাঠা-নায়ক দ্বিতীয় বাজিরাও (পেশোয়া) ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ করিলেন। দোয়াব, কটক প্রভৃতি স্থানগুলি ইংরাজ অধিকারে গেল।

লর্ড মিণ্টোর আমলে রণজিৎ সিংহের সহিত বৃটিশের যে সন্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব দিকের কোনও রাজ্যের ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ না করিতে স্বীকৃতি দান করেন। তাহার ফলে, শতদ্রুর পূর্ব্ব-দিকস্থ শিখ-নায়কগণ বৃটিশের প্রভাবাধীনে চলিয়া গেলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী আবার ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে নূতন সনন্দ লাভ করিল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সনন্দ দিবার সময় এইবার কোম্পানীর উপর নানাবিধ সর্ত্ত আরোপ করিয়া তাহার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। কোম্পানীকে পুনরায় বিশ বৎসরের জন্য সনন্দ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর আর একচেটিয়া অধিকার রহিল না। ভারতের উপর ইংলণ্ডেশ্বরের সার্ব্বভৌম অধিকার ঘোষিত হইল।

মার্কুইস্-অফ-হেষ্টিংসের আমলে সেনাপতি অক্টারলোনীর অধি-নায়কত্বে নেপালের বিরুদ্ধে যখন অভিযান হয়, তখন নেপাল-দরবার সন্ধি করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সগৌলির সন্ধি-সর্ত্ত অনুযায়ী কুমায়ুন, গাড়ওয়াল এবং আরও নানা স্থান ইংরাজগণ লাভ করিলেন। সিকিমের উপর নেপাল-দরবারের আর কর্ত্তৃত্ব রহিল না।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধিদ্বারা ইংরাজগণ তৎকালীন পেশোয়ার নিকট হইতে কোঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ হস্তগত করেন। পরে পেশোয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং কয়েকটি যুদ্ধে তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কানপুরের কাছাকাছি বিঠুরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং স্থির হইল, যে, তিনি বৎসরে আট লক্ষ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজ-রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল এবং পেশোয়ার পদও আর রহিল না। বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শিবাজীর জনৈক বংশধর ক্ষুদ্রায়তন সাতারা রাজ্যের রাজা হইলেন।

আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লাও বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ঐ একই

বৎসরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত ভোঁস্‌লার রাজ্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং এক নূতন অধীন রাজাকে ভার দেওয়া হইল রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাসনের। ঐ সালেই হোলকারও যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে ব্রহ্ম-রাজের সহিত বৃটিশের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মরাজ্য তখন আসাম ও মণিপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ ইংরাজগণকে আক্রমণ করিলে বৃটিশ সৈন্যরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে আসাম সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করে। পরে বাষ্পীয় পোতে প্রেরিত একদল সৈন্য গিয়া রেঙ্গুণ অধিকার করে এবং ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যরা যুদ্ধে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। অবশেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ান্দাবোর সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মরাজ আসাম, আরাকান, টেনেসেরিমের উপকূল ও মার্ত্তাবানের খানিকটা অংশ ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। ভরতপুরের নূতন রাজা ইংরাজের প্রভুত্ব অস্বীকার করায় তাঁহাকে উৎখাত করিয়া এক মনোনীত রাজাকে ভরতপুরের সিংহাসনে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বসানো হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী আবার বিশ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য-শাসনের অধিকার-সম্বলিত নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইল। বাংলা দেশের গভর্ণর তখন হইতে ভারতের গভর্ণর-জেনারল্ উপাধি লাভ করিলেন। বেন্টিঙ্কের শাসনকালে জয়ন্তিয়া, কাছাড়, কুর্গ, এবং মহীশূর বৃটিশ-শাসনাধীনে আনীত হইল।

লর্ড এলেনবরা সিন্ধুর আমিরগণের বিরুদ্ধে অযথা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সিন্ধুদেশ ইংরাজ-অধিকারে আনয়ন করিলেন।

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। রণজিতের শক্তিশালী সৈন্যদল তাঁহার

পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেরাই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল এবং পূর্ব্বের মত তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাও আর বর্ত্তমান ছিল না। এই অবস্থায় লর্ড হার্ডিং-এর আমলে শিখগণের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শিখসৈন্যগণ পরাজয় বরণ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণ শিখদিগের নিকট হইতে কাশ্মীর, হাজারা জেলা, জলন্ধর-দোয়াব এবং শতদ্রু নদীর দক্ষিণাংশের সমুদয় ভূখণ্ড আদায় করিয়া লন। অবশিষ্ট অংশে দলীপ সিংহ নামে মাত্র রাজা হিসাবে বর্ত্তমান থাকিলেও কার্য্যতঃ সার হেন্‌রী লরেন্সই পাঞ্জাবের শাসন-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। শিখসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া একদল বৃটিশ সৈন্যকেও লাহোরে রাখিয়া দেওয়া হইল। ৭৫ লক্ষ টাকায় কাশ্মীর বিক্রীত হইল গোলাপ সিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকট। লর্ড ডালহৌসির আমলে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব সরাসরি বৃটিশ-রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং একটা বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় দলীপ সিংহের জন্য।

ডালহৌসি ছিলেন একজন জবরদস্ত বড়লাট। যে কোন উপায়ে রাজ্য-গ্রাসই ছিল তাঁহার মূল নীতি। কেবলমাত্র এক ঘোষণাপত্র দ্বারা অযোধ্যার নবাবের কুশাসনের আছিলায় বিনা কারণে তিনি তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। ইহা ব্যতীত আর একটি নূতন নীতিকেও ডাল-হৌসি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের উত্তরাধি-কার-গ্রহণ দাবী তিনি স্বীকার করিতেন না। ফলে কোনও রাজা যদি পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্রকে ডালহৌসি সিংহাসনে বসিতে না দিয়া তাঁহার রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিতেন। এইভাবে ঝাঁসী, সাতারা,

সম্বলপুর, নাগপুর, জৈৎপুর ইত্যাদি বহু রাজ্য ডালহৌসি বৃটিশ-শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। সিকিমের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্যের খানিকটা অংশও ডালহৌসির আমলে কাড়িয়া লওয়া হইল।

পেশোয়া বাজিরাও-এর মৃত্যুর পর ডালহৌসি তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে নবাবী পদ লোপ করা হইল। তাঞ্জোর রাজ্যের ব্যাপারেও অনুসৃত হইয়াছিল ঐ একই নীতি। হায়দ্রাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশ ও আরও কয়েকটি জেলা ইংরাজদের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন।

লর্ড ক্যানিং-এর আমলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্ব্ব-প্রথম ভারতব্যাপী মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই সংগ্রামের সময় বহুস্থানই ইংরাজদিগের হাতছাড়া হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বহু স্থানই পুনরায় জয় করিতে হয়। এই সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধীনে চলিয়া গেল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হইল ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান।

ইহাই ভারতবর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাণিজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদে এই ইতিহাস পুষ্ট এবং কপটতা, উৎপীড়ন, হত্যা ও অন্যায়াচরণের দ্বারা ইহা দুষ্ট ও কলঙ্কিত। বণিকের মানদণ্ড এইভাবেই একদিন রজনী-প্রভাতে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিযাছিল। জাহাঙ্গীরের রাজ-সভায় আগত সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থীর দল একদিন ভারতের শেষ স্বাধীনতার চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া প্রাপ্ত অনুগ্রহ ও আতিথ্যের যোগ্য প্রতিদান দিয়াছিলেন নিশ্চয়ই!

স্বাধীনতার
প্রথম মহাসমর—১৮৫৭

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

—রবীন্দ্রনাথ

মহাসংগ্রামের পটভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় এবং বহু নূতন নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এই বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা, শিখ ও রাজপুতদিগের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের একজনের স্বার্থের সহিত আর একজনের স্বার্থের কোনও সামঞ্জস্য ছিল না এবং সকলেই আপন আপন প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ঘরোয়া বিবাদ ও সংঘর্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল ইংরাজের ভারত-সাম্রাজ্য। ভারতীয় শক্তিসমূহ ইংরাজের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকটায় ইংরাজদিগকে নিজেদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ইংরাজগণকে বিচার করিতেন একটি বিদেশী বণিক্ জাতি হিসাবে—যাঁহাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ভারতবর্ষে ইংরাজরা যে একদিন অধিরাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন, ইহা ছিল তাঁহাদের কল্পনারও অতীত; সুতরাং নিজেদের গৃহ-বিবাদে স্ব স্ব শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিপক্ষের বিরুদ্ধে ইংরাজ-শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিন্তু যখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল, তখন সকলে দেখিতে পাইলেন যে, ধীরে ধীরে তাঁহাদের সকল স্বাধীনতাই লুপ্ত হইয়াছে। যে সকল স্থানকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ-শাসনাধীনে আনা হইয়াছিল, সেগুলির তো কথাই নাই—দেশীয় রাজ্যগুলিরও অধিকাংশকেই হয় "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে নতুবা অপুত্রক রাজার দত্তকপুত্র গ্রহণের দাবী স্বীকার না করিয়া ইংরাজের মনোমত কোনও শাসককে

সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট রাজ্যগুলিরও নিজেদের বিবেচনামত কার্য্য করিবার স্বাধীনতা নাই। আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত-বর্ষটাই তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ও নির্দ্দেশে শাসিত হইতেছে।

আসল অবস্থাটা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিবার পর হইতেই সকলের মনেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ভারতীয় সিপাহীদের মনে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা জমিয়া উঠিতেছিল; কারণ বৃটিশদের জন্য তাহারা রাজ্য জয় করিত, কিন্তু যোগ্য সমাদর ও বেতন লাভ করিত না, উপরন্তু নানা লাঞ্ছনাই ভোগ করিত। ইংরাজগণ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন না। কোনও উচ্চ পদে ভারতীয়ের নিয়োগ অসম্ভব ছিল বলিলেই চলে। সেনা-বিভাগের কোনও ব্যক্তি অধিক যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেই তাহাকে বিদায় দেওয়া হইত। একজন সাধারণ ইংরাজ সৈনিকের বেতন একজন ভারতীয় সিপাহী অপেক্ষা ছিল অনেক বেশি। অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে বহু সৈনিককে বেকার হইয়া পড়িতে হইয়াছিল এবং ইহাতে তাহারা অতিশয় ক্ষিপ্তও হইয়াছিল। এই সকল বেকার সৈনিকের বহু আত্মীয়-স্বজন ইংরাজদের অধীনে সৈন্যদলে কাজ করিত এবং এই সকল সঙ্গতিবিহীন বেকার সৈনিকের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইংরাজদের উপর তাহারাও রুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ-সাম্রাজ্য দিনে দিনে বিস্তৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদিগেরও বহু দূর-দূরান্তরে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছিল, অথচ ইহার জন্য তাহাদিগকে অতিরিক্ত কিছুই দেওয়া হইত না; উপরন্তু কতকগুলি সুবিধা হইতে ক্রমশঃ সিপাহীদিগকে বঞ্চিত করা হইল। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কোনও সিপাহী খৃষ্টান হইলেও তাহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া লোভও দেখান হইত। সমুদ্র-যাত্রায় হিন্দু সিপাহীদের আপত্তি গ্রাহ্য করা হইত না।

নূতন ভূমি-বন্দোবস্তে বে-পরোয়াভাবে খেয়াল-খুসি মাফিক কাজ করা হইতেছিল। লোকের মনে একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠার ইহা অন্যতম কারণ। সমস্ত দলিলপত্র অগ্রাহ্য করিয়া জমিদার ও তালুক-দারদের নিকট হইতে জায়গা-জমি কাড়িয়া লইয়া উচ্চহারে রাজস্বের বিনিময়ে সেইগুলি বিলি করা হইতে লাগিল। জনসাধারণ উৎপীড়িত হইতে লাগিল নূতন নূতন ধার্য্য করে। ইহার উপর আবার দেখা দিল মুদ্রা-সঙ্কট।

যে সকল রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছিল, বৃটিশের স্বেচ্ছাচারিতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্য তাঁহারাও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। যে সকল রাজাকে কেবল বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয় নাই—তাঁহারাও বিশেষ নিশ্চিন্ততা বোধ করিতে পারিতেছিলেন না; কারণ যে কোনও মুহূর্ত্তে যে তাঁহাদিগকেও সিংহাসনচ্যুত করা হইতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা তাঁহাদের মনেও বর্ত্তমান ছিল।

দেশে তখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার। নানা স্থানে আশ্রয়-কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্র, অনাথ, নিরাশ্রয় শিশুদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। সমগ্র ভারতবর্ষকে একদিন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার শুভ সম্ভাবনার বিষয় বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর্সে'র সভাপতিও পার্লামেণ্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন। দেশে তখন রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ লাইন ইত্যাদির নূতন পত্তন হইতেছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এই প্রসারেও জনসাধারণ অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

এইভাবে নানা কারণে সকলের মনেই ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে লাগিল। ১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের যে অবস্থা—তাহাকে

বারুদাগারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সংযোগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পূর্ণ সম্ভাবনা তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মহাসংগ্রামের নায়কবর্গ

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ তখন দিল্লীতে নামে মাত্র মোগল-সম্রাট্। দেশের বিদ্রোহকামী নায়কবর্গ তাঁহাকেই সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। বিদেশী শাসনকে দেশ হইতে নির্ম্মূল করিবার উদগ্র প্রেরণায় হিন্দু ও মুসলমান—দেশের এই দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সম্প্রীতি স্থাপিত হইল। ইংরাজ-বিতাড়নে হিন্দুদের সাহায্য পাইলে গো-কোরবানী বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল বেরিলীর বাহাদুর খানের ঘোষণায়। বাহাদুর শাহ্ও সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দেশে গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য নির্দ্দেশ দান করিলেন। ইংরাজ-বিতাড়নই ছিল সম্রাটের মূল লক্ষ্য—সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। সেইজন্য উপযুক্ত নায়কের নেতৃত্বে সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হউক,—ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত বাসনা। বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করার কার্য্যে যে সকল রাজা সহায়তা করিবেন, তাঁহাদের সম্মতিক্রমে গঠিত নৃপতি-সংসদের হস্তে শাসনভার দান করিয়া তিনি সিংহাসন-ত্যাগেও প্রস্তুত ছিলেন। বিদ্রোহীরাও তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত যে, তাহারা যখন দিল্লীতে বাহাদুর শাহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি অর্থাভাববশতঃ তাহাদের বেতন দিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেও তাহারা নিরুৎসাহ হয় নাই। জাতীয় সম্মান রক্ষাই তখন তাহাদের নিকট বড় কথা—বেতনের প্রশ্ন নয়। তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল—সকল স্থানের বৃটিশ-ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তাহারা বাহাদুর শাহ্কে প্রদান করিবে।

উত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং পরস্পর পৃথক্ দল ও শক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনে নানা সাহেব, আজিমুল্লা খান ও তাঁতিয়া টোপীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেব ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নানা সাহেব ছিলেন অতিশয় কূট কৌশলী এবং তাঁহার বাহিরের আচার-আচরণ দেখিয়া তাঁহার ভিতরের আসল মানুষটিকে চেনা সহজ ছিল না। যাহারা পেশোয়ার সম্মান ও বৃত্তি হইতে তাঁহাকে স্বৈরাচারের দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে কি পরিমাণ তীব্র বিদ্বেষ তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, তাহা তাঁহার বাহ্যিক আরাম-বিলাস দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই নানা সাহেবই ছিলেন ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের রহস্যময় মহানায়ক। রাজ্যভ্রষ্ট ও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত অবস্থায় তিনি কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে একজন কেরাণী হিসাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে সৈন্য-সংগঠন ও বিদ্রোহের বাণী প্রচারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তাঁহার পরাক্রম ও দক্ষতায় বৃটিশ সৈন্যগণকে বহুবার ঘোর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

আজিমুল্লা খান ছিলেন নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ছিলেন একজন কূটনীতি বিশারদ। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ইংরাজগণের খানসামা কিন্তু নিজের প্রতিভায় তিনি নানা সাহেবের প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠেন। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। পেশোয়ার মামলা কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য নানা সাহেব তাঁহাকে ইংলণ্ডেও পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে এবং ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে তিনি ইংরাজদিগের রণক্ষমতা এবং সমর-কৌশল সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যা-

বর্ত্তনের পথে তিনি ভারতীয় বিদ্রোহে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নানা সাহেবের সেনাপতি ছিলেন রণ-নিপুণ মারাঠি ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া টোপী। তাঁতিয়া টোপী নানা সাহেবের আবাল্য বন্ধু ও কল্যাণকামী।

তাঁতিয়া টোপী

শৌর্য্য-বীর্য্য এবং কূট-কৌশলের সংমিশ্রণে তাঁতিয়া টোপী ছিলেন অসাধারণ—তাঁহার তুলনা কেবলমাত্র তিনি নিজেই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ফলে বহু বিপদ-আপদ হইতে বহুবার বিদ্রোহীরা রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজ্যের অজেয় সেনাবাহিনী, দুর্গ ও ধনভাণ্ডার বিদ্রোহীদের অধীনে আসিয়াছিল।

এই বিদ্রোহের ইতিহাসে ঝাঁসীর অসামান্যা রূপসী বিশ বৎসর বয়স্কা

রাজ্যচ্যুতা বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ আপনার মহিমায় আপনি সমুজ্জ্বল। স্বীয় রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি বিদ্রোহিগণের নেত্রীত্ব লইয়া পুরুষের বেশে তরবারি হস্তে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেন এবং অশ্বারোহণে তিনি ছিলেন অতিশয় নিপুণা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ সাহস ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইংরাজেরা যখন তাঁহার রাজ্য বলপূর্ব্বক দখল করেন, তখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়াছিলেন,—"মেরি ঝাঁসী নেহি দেউঙ্গী।" সেই উক্তির যাথার্থ্য তিনি নিজের প্রাণ দিয়াও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের উৎসাহ এবং প্রেরণার উৎস। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে ইংরাজ-সেনাপতিকেও বলিতে হইয়াছিল,—"যদিও তিনি নারী, তবু বিরুদ্ধপক্ষে তাঁরই সমরকুশলতা ছিল সবার চেয়ে বেশি।"

মহাবিদ্রোহের অপরাপর নায়কগণের মধ্যে বিহারের জমিদার-সন্তান রাজা কুমার সিংহ এবং ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ শাহের নাম করিতে হয়। গেরিলা যুদ্ধে কুমার সিংহের ছিল অসাধারণ দক্ষতা। বয়সে তিনি বৃদ্ধ হইলেও কর্ম্মক্ষমতায় তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। আহম্মদ শাহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বৃটিশের বিরুদ্ধে অযোধ্যার সুপ্ত জনসাধারণকে তিনিই করিয়াছিলেন জাগ্রত এবং উদ্বোধিত। ইংরাজদের দ্বারা ধৃত হইয়া তাঁহার ফাঁসির আদেশ হইলে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীরা জেলখানা ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল।

মহাসংগ্রামের ব্যাপ্তি এবং প্রচণ্ডতা

বৃটিশের তখন বড় দুর্দ্দিন। তখন তাঁহাদের যুদ্ধ চলিতেছিল ইউরোপে রাশিয়ার সহিত এবং এশিয়ায় চীন দেশের সহিত। সেইজন্য ভারতবর্ষে অধিক সৈন্য নিয়োগ করা ইংরাজগণের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষে তখন ইংরাজসৈন্য ছিল মাত্র ৪০ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্য

ছিল প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার। ভারতীয় সৈন্যগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ইংরাজগণ তখন বহু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিও ভারতীয় সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; সুতরাং এক-যোগে ভারতের নানা স্থানে অভ্যুত্থানের দ্বারা বৃটিশ-শক্তিকে পর্য্যদস্ত করিবার জন্য গোপনে গোপনে চতুর্দ্দিকে প্রস্তুতি চলিতে লাগিল।

বিদ্রোহের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ইহা প্রচারিত হইল যে, ভারতে বৃটিশ-শাসনের সমাপ্তি ঘনাইয়া আসিয়াছে। গণৎকার, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির -সকলেই ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে,পলাশির যুদ্ধের এক শত বৎসর পরে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিবে—ইহাই বিধিলিপি। এই ঘোষণায় সকলের মনে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব আসিল এবং শত্রুকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হইল। বিদ্রোহের বাণী বহন করিয়া বিদ্রোহের প্রতীক স্বরূপ রক্ত-পদ্ম এক তাঁবু হইতে আর এক তাঁবুতে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে লাগিল। ইহা স্থির হইল যে, ২৩শে জুন তারিখে পলাশির যুদ্ধের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিপাহীরা একযোগে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে।

বিদ্রোহীদের প্রধান কর্ত্তব্য নিরূপিত হইল—রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, ধনাগার ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বারুদাগার ও দুর্গ দখল, জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের মুক্তিদান এবং ইংরাজ অফিসারদের হত্যাসাধন। সম্মুখযুদ্ধ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতিই তাহাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

বৃটিশের স্বৈরাচার, হত্যা, লুণ্ঠন এবং তাঁহাদের কৃত অন্যায় ও অপ-মানের বিরুদ্ধে সমগ্র উত্তর ভারত যখন এইভাবে গুপ্ত এবং প্রকাশ্য

প্রস্তুতিতে লিপ্ত, তখন সহসা সিপাহীদের মধ্যে প্রচলন করা হইল নবাবিষ্কৃত এন্‌ফিল্ড রাইফেলের। এই রাইফেলে টোটা ভর্ত্তির পূর্ব্বে দাঁত দিয়া খানিকটা কাটিয়া লইতে হইত। টোটার কার্টিজ তৈয়ারী হইত শূকর ও গরুর চর্ব্বি দিয়া। শূকর মুসলমানদের নিকট ঘৃণ্য এবং গোমাংস হিন্দুদের নিকট নিষিদ্ধ; সুতরাং সিপাহীরা ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহের তারিখ স্থির হইয়াছিল ২০শে জুন, কিন্তু সিপাহীদের যেন আর বিলম্ব সহিতেছিল না। এক নূতন উন্মাদনায় তাহারা তখন চঞ্চল ও অস্থির। ইউরোপীয় অফিসারদের প্রতি দারুণ বিদ্বেষে তাহাদের মন তখন তিক্ত। "বেঙ্গল আর্মি"র সিপাহীরাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং মার্চ্চ মাসেই ২৯শে তারিখে সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরের সৈন্য-নিবাসে জ্বলিয়া উঠিল বিদ্রোহের আগুন। মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন ব্রাহ্মণ সৈনিক ছিল ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। অশ্ব-পৃষ্ঠস্থিত এ্যাডজুট্যাণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া তাহাকে সে গুলি করিয়া হত্যা করিল। নূতন স্থাপিত টেলিগ্রাফ অফিসটি বিদ্রোহীরা দিল পুড়াইয়া। দিন সাতেকের মধ্যেই মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়া হইল।

কিন্তু ফাঁসির ভয় দেখাইয়া সিপাহীদিগকে শান্ত করার যুগ সেটা নয়। জীবন পণ করিয়া তাহারা তখন স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। মঙ্গল পাণ্ডে যেন উদ্বোধন করিয়া গেল আসন্ন মহাসংগ্রামের। অসন্তোষের বারুদাগারে সে যেন যোগ করিয়া গেল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহের আগুন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ১০ই মে বিদ্রোহের সুরু হইল মীরাটে এবং ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া ১২ই তারিখে বিদ্রোহীরা গিয়া দিল্লী অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অচিরেই দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারেও

আসিল। কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহ দেখা দেয় ২৩শে মে এবং লক্ষ্ণৌ-এ ৪ঠা জুন। ৫ই জুন তারিখে কানপুরে বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই উহা অবরুদ্ধ হয় এবং ২৭শে জুন তারিখে জেনারল হুইলার আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।

স্বাধীনতার জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত বিদ্রোহীরা নানা স্থান হইতে দিল্লীতে গিয়া সমবেত হইতে লাগিল। পথে তাহারা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের গৃহে অগ্নি-প্রদান করিল; জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের দিল মুক্তি, তোষাগার করিল দখল এবং সুবিস্তৃত অঞ্চলের রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করিয়া, ডাক আটক করিয়া ও সমস্ত পথ-ঘাটের উপর কড়া নজর রাখিয়া সকল সংযোগ ব্যবস্থা প্রায় রহিত করিয়া দিল। দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন যোগাযোগই রহিল না। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত কণ্ঠ হইতে বিজয়-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল,—"দিল্লী চলো—চলো দিল্লী।" বৃটিশ শাসকদিগকে তাহারা গর্জ্জন করিয়া হুকুম করিল,—"হিন্দুস্থান ছোড়্ দো।"

প্রাচীন ভারতের রাজধানী দিল্লী যখন অধিকৃত হইল—তখন বিদ্রোহী-দের মনোবল আরও বর্দ্ধিত হইল। সামরিক দিক দিয়াও ইহাতে তাহাদের লাভ নেহাৎ কম হইল না। ৯,০০,০০০ কার্তুজ, ৮০০০ কামান, ১০,০০০ বন্দুক এবং ১০,০০০ পিপে বারুদ ইহার ফলে তাহাদের অধিকারে আসিল। মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন সকল বিদ্রোহী নেতাই; সুতরাং পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। শীঘ্রই বিদ্রোহ বুন্দেলখণ্ড, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য ভারত ইত্যাদি নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দিল্লী, কানপুর, বেরিলী, ঝাঁসী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি স্থানগুলি হইয়া দাঁড়াইল বিদ্রোহীদের প্রধান-প্রধান ঘাঁটি।

নানা স্থানে আরম্ভ হইল তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পুলিশ, সৈন্যদল ও নাগরিকেরা রোহিলখণ্ডের নানা সহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সমগ্র রোহিলখণ্ডে বৃটিশ-শাসন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অযোধ্যায় সিপাহী-দিগের সহিত এক লক্ষ লোকও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বিদ্রোহে যোগদান করিল এবং অধিকৃত দুর্গ ও গ্রামগুলিকেও তাহারা অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া নির্ম্মাণ করিল এক সুদৃঢ় ঘাঁটি। ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদাই জনসাধারণ অসহযোগ করিতে লাগিল। নানা উপায়ে তাহারা বৃটিশ বাহিনীকে ভুল খবর দিত এবং চেষ্টা করিত তাহাদিগকে বিপদে ফেলিতে। বৃটিশ বাহিনীর গতিবিধি এবং তাহাদের পরিকল্পনার বিষয় আশ-পাশের লোকেরা আসিয়া বিদ্রোহিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া যাইত।

বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সার রিচার্ড টেম্পল্ ইতালী হইতে ভারত-বর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতি হেভলক পারস্য হইতে জলপথে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

দিল্লী পুনরায় জয় করিতে ইংরাজদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়া-ছিল। আম্বালা হইতে সৈন্যদল গিয়া দিল্লীর উত্তরদিকের পাহাড় দখল করিল। অবশেষে পাঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য সাহায্য আসিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর কাশ্মীর ফটক তোপে উড়াইয়া দিয়া কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ দিল্লী আক্রমণ করিয়া সহরে প্রবেশ করা হইল। দিল্লী ইংরাজদের দ্বারা পুনরধিকৃত হইল পথে পথে ও গৃহে গৃহে সিপাহী ও নাগরিকদের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামের পর। জন নিকলসন দিল্লীর যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন।

লক্ষ্ণৌ-এর চীফ কমিশনার সার হেনরী লরেন্স সেখানকার ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া যখন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধির ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—তখন বিদ্রোহিগণ উহা অবরোধ করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ হেভলক্

বাধ্য হইলেন হটিয়া যাইতে। সার হেনরী লরেন্স-এর মৃত্যু হইল, কিন্তু ইউরোপীয়গণ কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। হেভলক্ ও আউটরাম ইংরাজগণের সাহায্যার্থে নূতন সৈন্যদল লইয়া গেলেন। অবশেষে সার কলিন ক্যাম্বেল গিয়া ইংরাজগণকে উদ্ধার করিলেন। ১৮৫৮ সালের ২০শে মার্চ্চের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ইংরাজদের দ্বারা পুনরধিকৃত হইল।

দিল্লীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত কাশ্মীর ফটক। বিদ্রোহিগণ দৃঢ়ভাবে ইহা রক্ষা করে এবং কঠিন সংগ্রাম ও প্রভূত সৈন্য ক্ষয়ের দ্বারা ইংরাজগণকে ইহা পুনরধিকার করিতে হয়।

নানা সাহেব যে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে গিয়া বাস করিতে-ছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কানপুরের বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন তিনিই। ৫ই জুন কানপুরে বিদ্রোহের আরম্ভ এবং ২৭শে জুন হুইলারের আত্মসমর্পণের বিষয়ও বলা হইয়াছে। শঠের সহিত কিরূপভাবে শঠের মত আচরণ করিতে হয়, নানা সাহেবের তাহা জানা ছিল। প্রায় হাজারখানেক ইংরাজ নর-নারী কানপুরে একটা দেওয়ালের অন্তরালে থাকিয়া অতিকষ্টে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে দিবার আশ্বাস দিলেন।

সেই আশ্বাসে তাঁহারা বাহির হইয়া নদী-তীরে পৌছাইবা মাত্র বিদ্রোহীরা তাঁহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের অধিকাংশই প্রাণ হারাইলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে বন্দী প্রায় দুই শত নারী ও শিশুকে নিহত করিয়া কূপে নিক্ষেপ করা হইল। ১৭ই জুলাই হেভলক্ কর্তৃক কানপুর পুনরায় অধিকৃত হয়। নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহীরা পরে আরও একবার কানপুর অধিকার করে। ৬ই ডিসেম্বর সার কলিন ক্যাম্বেল কানপুরকে সম্পূর্ণরূপে দখল করেন।

মে মাসে বেরিলাতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পর হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে বিদ্রোহীরা নবাব বলিয়া ঘোষণা করে। ১৮৫৮ সালের ৬ই মে সার কলিন ক্যাম্বেল বেরিলা বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লন।

ঝাঁসীতে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। সেখানেও যথারীতি ইউরোপীয়গণকে হত্যা করা হইল। রাণী লক্ষীবাঈ-এর নেত্রীত্বে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। অবশেষে এক সময় যখন যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন লক্ষীবাঈকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁতিয়া টোপী সসৈন্যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাকে সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। সার হিউরোজের সৈন্যদলের সহিত পুরুষের বেশে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন রাণী লক্ষীবাঈ প্রাণত্যাগ করেন। বিদ্রোহের মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ইংরাজগণ ঝাঁসী অধিকার করিলেন।

বিহারে জগদীশপুরে রাজা কুমার সিংহের পরিচালনায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে তীব্র গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নিজ রাজ্য জগদীশপুরকে

বৈদেশিক অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কুমার সিংহ সেখানে নিজের পতাকা উড্ডীন করেন। রণক্ষেত্রে তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের স্বাধীন পতাকার নীচেই তিনি জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীদের মহাসংগ্রাম প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঐ সালের ৩রা জানুয়ারি, ৪ঠা মার্চ্চ এবং ৩রা মার্চ্চের মধ্যে যথাক্রমে দোয়াব, অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ড ইংরাজদের হস্তে চলিয়া যায়। অযোধ্যায় এবং আরও কোনও কোনও স্থানে অবশ্য আরও কিছুদিন ধরিয়া বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-সংগ্রাম চলিয়াছিল।

প্রধান প্রধান স্থানে যখন বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় বরণ করিতে হইতেছিল, তখন ১৮৫৮ সালের ২রা জুন তাঁতিয়া টোপীর অপূর্ব্ব দক্ষতায় গোয়ালিয়র আসিল বিদ্রোহীদের অধিকারে। ২০শে জুন কিন্তু গোয়ালিয়রের পতন ঘটিল। তাঁতিয়া টোপী পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং বৃটিশের সৈন্যবাহিনী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। পলায়িত অবস্থায়ও তাঁতিয়া টোপী চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল একটি গভীর অরণ্যে নিদ্রিতাবস্থায় থাকা কালে তাঁহারই একজন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বৃটিশের হস্তে ধরা পড়িলেন। ১৮ই এপ্রিল এই বীর যোদ্ধাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

কানপুর হইতে পলায়নের পর নানা সাহেবের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আজিমুল্লা খান বিদ্রোহের শেষ অবস্থায় ফল-বিক্রেতার ছদ্মবেশে লক্ষ্ণৌ-দুর্গে অবস্থান কালে ইংরাজদের দ্বারা ধৃত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত করা হইল। ইহার পর

তিনি আরও চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। অন্ধকার জেলখানায় অর্দ্ধভগ্ন কাষ্ঠনির্ম্মিত চারপায়াতে তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত। তাঁহার দুই পুত্র

ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত অবস্থায় দিল্লীর সর্বশেষ মুঘল-সম্রাট বাহাদুর শাহ্

এবং এক পৌত্র লেপ্‌টেন্যান্ট হড্‌সন দ্বারা ধৃত হইয়া অমানুষিকভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদ্রোহীদের চরম আত্ম-বিসর্জ্জন, এইভাবে বিফলতায় সমাপ্তিলাভ করিল। তাহা হউক, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বিদ্রোহীরা রাখিয়া গেল আদর্শ এবং প্রেরণা। বিদ্রোহের সময়ে এবং পরে বিদ্রোহিগণকে এবং জনসাধারণকে অকথ্য নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনায় উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে, বিজয়ী বিদেশী শত্রু হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে অবাধে এবং পাইকারীভাবে। ঝাঁসীতে ৭৫ জন ইংরাজের জীবনের বিনিময়ে ৫০০০ লোককে হত্যা করা হয় এবং ঝাঁসী নগরী লুণ্ঠন করা হয় কয়েক দিন ধরিয়া। দিল্লীতে কয়েকজন ইংরাজকে হত্যার প্রতিশোধ লওয়া

হয় প্রায় ২৬,০০০ হাজার লোককে নিহত করিয়া। লাহোরের সিপাহীরা দুইজন বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করায় বহু সিপাহীকে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্ট বহু প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আটক সিপাহী আতঙ্কে, গরমে ও ক্ষুদ্র কক্ষে বিষম শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারায়। প্রায় ৬০০০ জন ভারতীয়কে হত্যা করা হয় এলাহাবাদে। নর, নারী, শিশু ও বৃদ্ধ—ইংরাজগণের হস্তে নির্ব্বিচারে প্রাণ হারাইয়াছে। বৃটিশ সৈন্য যে পথ দিয়া গিয়াছে—তাহার পার্শ্বস্থিত সকল কিছু ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। পথের দুইধারের গাছ-গুলিতে ভারতীয়দের মৃতদেহ ঝুলাইতে ঝুলাইতে ক্যাপ্টেন নীল এলাহাবাদ হইতে কানপুর গিয়াছিলেন। কামানের মুখে নিরীহ অধিবাসীদের উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শূকরের চামড়ায় মুড়িয়া সেলাই করিয়া মুসলমানদিগকে নদীতে নিক্ষেপ, কবর না দিয়া তাহাদের মৃতদেহ দাহ করা, শূকরচর্ব্বিতে নিমজ্জিত করিয়া তাহাদের ফাঁসি দেওয়া এবং হিন্দু-দিগকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক গো-মাংস ভক্ষণ করানো ইত্যাদি শাস্তি-বিধানের নানাবিধ উৎকট পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। ফতেপুর সহরে বিদ্রোহ হওয়ায় সহরের পাঠান-বস্তী আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে হত্যার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ধন-সম্পত্তি হইতে লোককে খেয়াল-খুসি মত বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

সংগ্রামে বিদ্রোহীদের অসাফল্যের কারণগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বাহিরে তখন ক্রিমিয়া ও চীন যুদ্ধের সমাপ্তি হইয়াছিল এবং পারস্যও পরাজয় বরণ করিয়াছিল; আফগানদের সহিত ইংরাজগণের হইয়াছিল সখ্যমূলক সন্ধি; সুতরাং বৃটিশ সরকার নিশ্চিন্ত হইয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ সৈন্য নিয়োগের সুবিধা পাইয়াছিলেন। বড় বড় বন্দরগুলি ছিল ইংরাজদের নিকট উন্মুক্ত; কাজেই দলের পর দল নূতন নূতন সৈন্য আনিয়া বিদ্রোহীদের দমন করা অসম্ভব হয় নাই। এইভাবে

ইংলণ্ড হইতে এক লক্ষ বারো হাজার বৃটিশ সৈন্য (তখনকার বৃটিশ সৈন্য সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক) ভারতে আনিয়া বিদ্রোহ-দমনকার্য্যে নিয়োজিত করা হয়। যে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রচলন লইয়া বিদ্রোহের সাক্ষাৎ সুরু, সেই নবাবিষ্কৃত শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগও ইংরাজরা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র তো তাঁহাদের ছিলই। বিদ্রোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র প্রচুর তো ছিলই না, বরং যাহা ছিল, তাহাও পুরাণো ধরণের। বিদ্রোহ-দমনে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করেন নাই। ৬৫ কোটিরও অধিক অর্থ তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেই তখন ইংরাজদের মনোনীত শাসক ক্ষমতায় সমাসীন ছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকাংশ রাজ্যের দেওয়ান কে হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দিতেন। বৃটিশের পরাজয়ে এই সকল শাসকের অনেকেরই সিংহাসনচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কারণ যাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরাজগণ ইঁহাদিগকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন—তাঁহারা ইংরাজগণের পরাজয় ঘটিলে সহজেই সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত নবপ্রচারিত প্রগতিমূলক ভাবধারারও এই সকল শাসকরা ছিলেন একেবারেই বিরোধী; সুতরাং অধিকাংশ সামন্তরাজ্যের শাসকই ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। উত্তরাধিকারশূন্যতার অজুহাতে দেশীয় রাজ্যগুলির বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে যে সামান্য অভিযোগ তাঁহাদের ছিল, তাহাও বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড ক্যানিং গোপনে তাঁহাদের দত্তক-গ্রহণ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার আশ্বাস দিয়া দূরীভূত করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই আর্ম্মি এবং শিখগণ বিদ্রোহে যোগদান

করেন নাই। প্রধানতঃ বেঙ্গল আর্ম্মির দ্বারাই বিদ্রোহ পরিচালিত হইয়াছিল। বিদ্রোহের প্রধান অবলম্বন ছিল সিপাহীরা, অধিকারবঞ্চিত রাজন্যবর্গ এবং হৃতসম্পত্তি ভূস্বামিগণ—যাহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে এই মহাসংগ্রামে জনসাধারণ যোগদান করিলেও সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র লোকেরা ও কৃষকরা ছিল বিদ্রোহের সহিত সম্পর্কশূন্য; সুতরাং ভারত-ব্যাপী ব্যাপক গণ-বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে নাই। ইহার ফলে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে জন সৈন্য সংগ্রহ করাও ইংরাজদের পক্ষে সহজ ছিল।

ইহা ব্যতীত, বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ নিরূপিত হইয়াছিল ২৩শে জুন—পলাশির যুদ্ধের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, কিন্তু কোনও কোনও স্থানের বিদ্রোহীরা অধীর হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই বিদ্রোহ করিয়া বসিল। একযোগে সর্ব্বত্র আকস্মিক বিদ্রোহের দ্বারা বিদ্যুৎগতিতে যে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা ছিল—ইহার ফলে তাহা নষ্ট হইয়া গেল। কোথাও বিদ্রোহ ঘটিল কিছুদিন পূর্ব্বে—কোথাও বা কিছুদিন পরে। ইহার দ্বারা বিদ্রোহ ব্যাপক ও প্রচণ্ড না হইয়া অনেকটা খণ্ড-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিল। সিপাহীদের পরিকল্পনাও গেল পূর্ব্ব হইতে ফাঁস হইয়া—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সুযোগ পাইলেন সাবধান ও প্রস্তুত হইবার।

যাহা হউক, ইহাই আমাদের স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম মহাযুদ্ধ। প্রচণ্ডতায় ইহা ভয়াবহ—সাহসে অতুলনীয়—আত্মবিসর্জ্জনে অক্ষয় এবং উদ্দেশ্যে মহান্। বীর শহীদদের রক্তে এই ভারতভূমি সিক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

ওয়াহাবী আন্দোলন

ও

নীল বিদ্রোহ

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

—নজরুল ইস্‌লাম

ওয়াহাবী আন্দোলন

একদিকে যখন সিপাহী বিদ্রোহের দ্বারা সমগ্র উত্তর ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত হইতেছিল, তখন ইংরাজশক্তিকে ভারত হইতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর মুসলমান স্বতন্ত্রভাবে এক ষড়্‌যন্ত্রে রত হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট্-এর প্রতি ইংরাজগণ যে ঘৃণিত আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইঁহারা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। পেশোয়ার হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের ষড়্‌যন্ত্রের ক্ষেত্র ছিল প্রসারিত এবং ইহাদিগের আন্দোলন এত সংগোপনে পরিচালিত হইত যে, বহুদিন পর্য্যন্ত এই আন্দোলনের বিষয় ইংরাজগণ জানিতে পারেন নাই। এই আন্দোলনের সহিত কেবল-মাত্র মুসলমান-সম্প্রদায়ই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন জনাব সৈয়দ আহম্মদ। রায়বেরিলী প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পিণ্ডারী দস্যুদলের একজন অশ্বারোহী সৈনিক। পরবর্ত্তীকালে তিনি উক্ত দল ত্যাগ করেন এবং দিল্লীতে গিয়া একজন মৌলভীর অধীনে শাস্ত্র আলোচনায় রত হন। এই সময় ক্রমশঃ তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারত হইতে ইংরাজ-দিগকে বিতাড়িত করিবার জন্যই তাঁহার জীবন এবং এই কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ইংরাজগণের বিরুদ্ধে তিনি এক ষড়্‌যন্ত্র সংগঠিত করেন এবং বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। আবদুল ওয়াহেব এই সময় আরবের ইস্‌লামিক রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহার নিজ আদর্শ অনুযায়ী দীক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ

মক্কায় গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতে আসিয়া সেই আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। আবদুল ওয়াহেবের নাম হইতেই এই আন্দোলনের নাম হয় ওয়াহাবী আন্দোলন। শিখদিগের সহিত সংঘর্ষে এই আন্দোলনের শক্তি বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া যায় এবং ইংরাজগণও এই আন্দোলনকে দেন ব্যর্থ করিয়া। যুদ্ধরত অবস্থায়ই সৈয়দ আহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই আন্দোলনকারী দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মহম্মদ শফী। তিনি বৃটিশ সৈন্যদিগকে মাংস সরবরাহ করিতেন এবং সেই সুযোগে তাহাদের বহু গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার সুবিধা পাইতেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিতু মিঞা—যাঁহার পূর্ব্বের আর এক নাম ছিল নিসার আলি। একটি সাধারণ কৃষক-পরিবারে বসিরহাটে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দল গঠনের ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ এবং একটি বৃহৎ দল গঠন করিয়া কলিকাতা হইতে এই আন্দোলন তিনি পরিচালিত করিয়াছিলেন। এক চমকপ্রদ সংগ্রামের তিনি ছিলেন নায়ক। কলিকাতায় এক বাঁশের কেল্লা তৈয়ারী করিয়া তিনি দৃঢ়রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন—এমন কি, আশ-পাশের গ্রাম হইতে রাজস্বও আদায় করেন। ইংরাজরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে সেই বাঁশের কেল্লার মধ্য হইতেই তিনি ভীম বিক্রমে তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরে আরও বহু সৈন্য আমদানী করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়া তবে ইংরাজগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হন।

নীল বিদ্রোহ

নীলকরদিগের অত্যাচার আজ অতীতের দুঃস্বপ্নমাত্র—কিন্তু একদিন ইহাদেরই উৎপাতে বাংলার দরিদ্র কৃষকদের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া

উঠিয়াছিল। ইহাদিগের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ সালের মধ্যে।

এখন যেমন পাটের চাষ হয়, তখনকার দিনে তেমনই হইত নীলের চাষ। নীলের চারা জমিতে রোপণ করিয়া পরে গাছগুলি বড় হইলে সেগুলি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। তাহা হইতে পাওয়া যাইত নীল রং। কৃষকদিগের নিকট হইতে অল্প মূল্যে নীল ক্রয় করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা বিদেশে চালান দিত এবং মুনাফা লুটিত প্রচুর টাকা। যে কৃষকেরা নীলের চাষ করিত—তাহাদের দারিদ্র্য ইহাতে বিন্দুমাত্রও ঘুচিত না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন এই লাভজনক ব্যবসা গিয়া পড়িল কতকগুলি ইংরাজ ব্যবসাদারের হাতে। সমগ্র দেশে এই সকল ব্যবসাদারের অনেকগুলি কুঠি ছিল—সেগুলিকে বলা হইত নীলকুঠি। কুঠির মালিক সাহেবেরা নীলকর নামে পরিচিত ছিল। তখনকার দিনে ইহাদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ।

নীলকর সাহেবেরা আশ-পাশের গ্রামের চাষীদের জোর-জবরদস্তি করিয়া নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। কোনও কৃষক লোকসানের ভয়ে নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার উপর অত্যাচার উৎপীড়নের আর অন্ত থাকিত না। জোর করিয়া লোক দিয়া তাহাকে ধরিয়া আনা হইত কুঠিতে—তাহার পর আরম্ভ হইত তাহার উপর বিবিধ প্রকারের নির্য্যাতন। অশ্লীলভাবে গালাগালি দিয়া তাহাকে চড়, লাথি ও বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হইত, কয়েকদিন যাবৎ রাখা হইত আটক করিয়া, অথবা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে প্রাঙ্গণে ফেলিয়া রাখা হইত হাত-পা বাঁধিয়া। নীল বুনিতে অস্বীকার করার ফলে সময় সময় কোন

কোন চাষীর সমগ্র পরিবারের উপরই অত্যাচার করা হইত। স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিতেও নীলকর সাহেবেরা কসুর করিত না।

জেলায় জেলায় যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন—তাঁহারাও ছিলেন নীলকরদিগেরই স্বজাতীয়। কোনও ভারতীয়কেই তখন ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইত না। নীলকর সাহেবদিগের সহিত এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেটের খুব দহরম-মহরম থাকিত; একসঙ্গে খেলা, ক্লাবে আড্ডা দেওয়া, পানাহার ইত্যাদি—সবই চলিত। ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে ধারণা জন্মিত যে, নীলকর সাহেবগণও বোধ হয় গভর্ণমেণ্টপক্ষেরই লোক—সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নকট কোনও অভিযোগ করিতেও কেহ সাহস করিত না। বস্তুতঃপক্ষে ঐরূপ কোনও অভিযোগ আনিয়া ফললাভেরও সম্ভাবনা ছিল না।

ইহা ব্যতীত, তখনকার আইনও ছিল অদ্ভুত ধরণের। মফঃস্বলের কোনও আদালতে কোনও ভারতীয় কোনও ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিতে পারিত না। একমাত্র কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টেই এইরূপ নালিশ পেশ করা যাইত। তাহাতে অর্থব্যযও হইত প্রচুর এবং সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না।

নিরঙ্কুশভাবে নীলকরদিগের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। ইহার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দেখা দিল একটা চাঞ্চল্য এবং চতুর্দ্দিকে একটা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। এই সময় পিটার সাহেব আসিলেন বাংলা দেশের ছোটলাট হইয়া। তিনি আসিবার পর জলপথে তাঁহার মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ সফরের ব্যবস্থা হইল। তাঁহার ষ্টীমার যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নদীর উভয় তীরে সমবেত হইয়া নীল চাষের জন্য তাহাদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিল এবং নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিবার

জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের এই করুণ আবেদনে ছোটলাটও খানিকটা বিচলিত হইলেন এবং নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে নীলকর সাহেবেরা তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে খুসি করিতে বরং তাহাদেরই অনুকূলে আইন রচিত হইল। ইহার পর এই আদেশ জারি হইল যে, নীল চাষে কেহ বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে।

কিন্তু নীরবে অত্যাচার সহ্য করার মত শক্তি প্রজাসাধারণের আর অবশিষ্ট ছিল না। তাহারা অনেকটা তাহাদের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, সুতরাং আবেদন-নিবেদনের দ্বারা ফলোদয় না হওয়ায় তাহারা সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া নিজেরাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ব্যবস্থা করিল। ধন-সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য মনে জাগিল তাহাদের অটুট সঙ্কল্প। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা নীলের চাষ আর করিবে না। এইভাবে ১৮৫৯ সালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নীল চাষী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নীলকর ও নীলচাষের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করিল। বিক্ষোভ বিস্তৃত হইতে লাগিল বাংলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও। ইহাই ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

এই আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন যশোহরের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন :—

"কোনও বুদ্ধিহীন নীলকর যদি আতঙ্ক বা ক্রোধবশতঃ তখন একটিও গুলি বর্ষণ করিত, তাহা হইলে বাংলার একটি নীলকুঠিও রক্ষা হইত না; অগ্নি-প্রদান করিয়া জনসাধারণ সেগুলি ভস্মীভূত করিয়া দিত; কিন্তু

কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে যে আত্মশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হিংসার পথ ধরে নাই।"

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় সর্ব্বপ্রথম সাধারণের গোচরীভূত করেন। স্বর্গত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ বিক্ষুব্ধ কৃষকদিগের আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন চতুর্দ্দিকে দ্রুত প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছিল। বক্তৃতার দ্বারা তিনি কৃষকদিগের মনে সাহস ও প্রেরণার সঞ্চার করিতেন এবং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণও নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

কৃষকদিগের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট এবং নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার-উৎপীড়নকে বিষয়বস্তু করিয়া এই সময় দীনবন্ধু মিত্রের "নীল-দর্পণ" নাটক প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে নীলকর ও নীল চাষের উপর দেশের সকলেরই মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিল। জেমস্ লঙ্ নামে একজন সদাশয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কৃষকদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ দর্শনে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। নীল চাষীদের সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা "নীল-দর্পণ" নাটক ইংরাজিতে অনূদিত হয়; উদ্দেশ্য ছিল, ইহার সাহায্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় ইংলণ্ডে প্রচার করা। ইহার ফলে এদেশের কর্তৃপক্ষের ক্রোধ গিয়া পড়িল লঙ্ সাহেবের উপর। আদালতে তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাঁহার হইল এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও একমাস কারাদণ্ড। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার জরিমানার এক হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গেই আদালতে জমা দিয়া দিলেন—

আর সহাস্যমুখে লঙ্ সাহেব গেলেন বৃটিশের কারাগারে। "নীল-দর্পণ" নাটক অনুবাদ করার অপরাধে মাইকেল মধুসূদনের সরকারী চাকুরি আর রহিল না।

হরিশচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বেই। তাঁহার অকাল-বিয়োগে এবং লঙ্ সাহেবের কারাদণ্ডে দেশের লোকের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। নিম্নলিখিত গানটি তখন নানা স্থানেই শুনা যাইতে লাগিল :—

হায় রে, ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান ভার,—
নীল বাঁদরে সোনার বাংলা ক'র্‌লে এবার ছারেখার,
অসময়ে হরিশ ম'লো—লঙ্-এর হ'লো কারাগার।

যাহা হউক, এই আন্দোলন একেবারে বৃথা হয় নাই। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্রতা ইহা দ্বারা অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার পর আইন করিয়া প্রজাদের খানিকটা সুবিধাও করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালে জার্ম্মাণীতে কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈয়ারীর প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইবার পর বিদেশে ভারতীয় নীলের চাহিদা কমিয়া গেল এবং তাহার ফলে ধীরে ধীরে নীলের চাষও আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিল। বাংলা দেশের কৃষকদের বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল একটা দুশ্চিন্তার গুরুভার।

নীলচাষ-আন্দোলন কৃষকদিগের নিজস্ব আন্দোলন—এবং ইহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। এই আন্দোলন উপলক্ষ করিয়াই বাংলার অবহেলিত অত্যাচার-প্রপীড়িত কৃষকসমাজের আত্ম শক্তির বিকাশ ঘটে এবং গভর্ণমেণ্ট ও নীলকর সাহেবদিগকে ইহার নিকট কিয়ৎপরিমাণে নতি স্বীকারও করিতে হয়। কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি

ইহার প্রসার ও প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন সত্য—কিন্তু আন্দোলন মূলতঃ কৃষকগণের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে। কৃষকসমাজে এই সময় একটা অভূতপূর্ব্ব জাগরণ আসিয়াছিল—বাংলার শান্ত ও নিদ্রিত গণ-দেবতা যেন জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রথমে আবেদন-নিবেদন করিয়াছে; তাহাতে ফল না হওয়ায় শেষে জানাইয়াছে নীল চাষের বিরুদ্ধে তাহাদের দৃঢ় প্রতিবাদ; আন্দোলনের চরম পর্য্যায়ে তাহারা নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিয়া দুঃখ-লাঞ্ছনা বরণ করিয়াও ইহার বিরুদ্ধে করিয়াছে সত্যাগ্রহ। মুনাফালোভী নীলকর সাহেবদিগকে তাহারা বুঝাইয়া দিয়াছে তাহাদের অটুট সঙ্কল্পের বিষয়। এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, অতিশয় সঙ্কট মুহূর্ত্তেও ইহা সহিংস হইয়া উঠে নাই—যদিও সহিংস হইয়া উঠার পূর্ণ সম্ভাবনা ইহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

এখন আর নীল চাষ নাই—নীলকর সাহেবও নাই। বাংলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলে কোথাও কোথাও শুধু দুই-একটা ভগ্ন-জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ নীল-কুঠি এখনও অতীতের সেই অত্যাচার-উৎপীড়নের করুণ ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শীর মতো দাঁড়াইয়া আছে।

অগ্নি-যুগ

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

—রবীন্দ্রনাথ

সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজনৈতিক অবস্থা

সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে রূপায়িত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। ঐ বৎসরই ১লা নভেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় নানাবিধ পরিবর্ত্তনের বিষয় সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইল এবং ভারতবর্ষের শাসনভার মহারাণী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই অভ্যুত্থানের পর হইতে তাঁহাদের ভারত-শাসনের নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতীয়দিগকে ইংরাজগণ তখন হইতে বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি পরিস্ফুট হইয়াছিল, তুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সেই সম্প্রীতি দূরীভূত করিয়া বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করাই ইংরাজ-দিগের প্রধান লক্ষ্য হইল। তদুপরি চলিল নানা আইন রচনা করিয়া ভারতীয়দিগের স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস। এইভাবে লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Vernacular Press Act বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে Arms Act প্রণয়ণ করিয়া অনুমতি ব্যতীত ভারতবাসীর পক্ষে অস্ত্ররক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভারতীয়দিগের অপমানের চরম হইয়াছিল এই লর্ড লিটনের শাসনকালেই। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের অধিরাজ্ঞী বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। ইহার ফলে, কার্য্যতঃ বৃটিশ-অধিরাজত্ব স্বীকার করিলেও যে

সকল দেশীয় নৃপতি শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া এতদিন মিত্ররাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহারাও প্রকারান্তরে বৃটিশের অধীন সামন্ত-নৃপতিতে পরিণত হইলেন।

কিন্তু ভারতবাসীদিগকে দমিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মনে নূতন জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার হইতে লাগিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের আমলে যে চেতনা ও বিক্ষোভ কেবলমাত্র সিপাহী, রাজ্যচ্যুত নৃপতি এবং প্রতিপত্তিবিহীন ভূস্বামী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তাহা বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ছাত্র-সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় একটা জাতীয়তা-বোধ ও আত্মসম্মানবোধ যেন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই। সময়ের প্রয়োজনেই যে এই সকল বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব এবং উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এইভাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ—রাজনীতিবিদ্ হিসাবে আনন্দমোহন বসু, ডবলিউ, সি, বনার্জি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল—সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে পাইয়াছিলাম। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অপর নেতৃবৃন্দ তো ছিলেনই। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ভারত-বাসীদের মধ্যে একটা নবজাগরণ আসিল।

লর্ড রিপণের আমলে এতদ্দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়দিগেরও বিচার করিবার অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়া ইল্‌বার্ট বিল উত্থাপিত হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিলেরও বিরুদ্ধে কিন্তু ইউরোপীয়-সম্প্রদায় তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন—কেননা, ভারতীয় বিচারকের নিকট আসামী হইয়া উপস্থিত হইতে তাঁহাদের দারুণ লজ্জা ও অসম্মান। শেষ পর্য্যন্ত বিলটি পরিত্যক্ত হইল। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণের প্রবল ঘৃণা ও অবিশ্বাস ইল্‌বার্ট বিল-আন্দোলন উপলক্ষে প্রকটিত হইল।

যাহা হউক, অসন্তোষ ও অভিযোগ প্রকাশিত হইবার ন্যায়সঙ্গত পন্থাগুলি নানা বিধিনিষেধের দ্বারা রুদ্ধ হইলে চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে লাগিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হইলে গুপ্ত-আন্দোলনের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এ, ডি, হিউমের পরামর্শ ও উদ্যোগে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হইল ভারতীয় জাতীয় মহাসভার। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার দ্বারা ভারতীযদিগকে বৃটিশ-ভক্ত করিযা তুলিবার জন্য সিপাহী দ্রোহের প্রাক্কালেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মেকলে ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর চেষ্টায় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর বৃটিশ-অনুগ্রহপুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নাগরিকের উদ্ভব ঘটাইবার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। মিঃ হিউম ছিলেন লর্ড ক্যানিং-এর বন্ধু। তিনি দেখিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায় ইংরাজ-শাসনের মহিমায় মুগ্ধ না হইয়া বরং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে; সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রকাশ্য সভায় আবেদন-নিবেদনে রত একটি সীমাবদ্ধ আন্দোলনকারী নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক দল

হিসাবে মিঃ হিউমের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণের শাসনকালে।

নব-প্রতিষ্ঠিত এই কংগ্রে... দ্বারা কিন্তু দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের আশা-আকাজ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করিল না এবং দেশের সমস্যা সমাধানকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কংগ্রেসের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কংগ্রেসের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও কেবলমাত্র অতিশয় মোলায়েম ভাষায় বৃটিশের নিকট আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সমাপ্তিলাভ করিতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত চরমপন্থী সম্প্রদায় ইহাতে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া দাবী আদায়ের অন্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা যে পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—সে পথ ছিল হিংসার।

রক্ত দান এবং রক্ত গ্রহণই সে মার্গের সাধনা। চরমপন্থীরা অনন্যোপায় হইয়া সেই পন্থাই অনুসরণের সঙ্কল্প করিলেন। গোখলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, ভারতে ইংরাজগণের অনুসৃত নীতিতে হিংসার উদ্ভব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না; সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে গুপ্ত-হত্যার সূত্রপাত হইল।

রক্তের বদলে রক্তে বিশ্বাসী এই বিপ্লবীর দল জানিতেন যে বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাঁহারা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া মাতৃ-ভূমির বন্ধনপাশ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন না। তথাপি যে পররাজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদের দালালরা ভারতীয় জনমতকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া অবাধ প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বারা রাজ্য-শাসন করিতেছে, তাহাদিগকে খানিকটা শিক্ষা না দিয়াও তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। দেশ-প্রেমিকদের

ক্ষুব্ধ চিত্ত ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল আংশিক সান্ত্বনা। আবেদন-নিবেদনের শোচনীয় ব্যর্থতায় তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিলেন।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবান্দোলন

ইংরাজগণের কূট রাজনীতিও ইত্যবসরে সক্রিয় হইয়া উঠিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতেই ভারতীয় সমাজ-শরীরে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাফল্যও লাভ করিল; কারণ পরাধীন দেশে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে বিশেষ বেগ পাইবার কথা নয়। এই কারণেই মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং নূতন বিধি অনুযায়ী মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর বাদ্যভাণ্ড নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একদল মুসলমানও ধীরে ধীরে ইংরাজদের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" রচনাকালে হিন্দুদের মনে মুসলমান-বিদ্বেষ এই কারণেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সার সৈয়দ আহ্মদ কর্তৃক "প্যাট্রিয়টিক এশোসিয়েশন" নামে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ইহার পর ১৮৯৩ সালে বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানে বাধিল দাঙ্গা এবং দক্ষিণ-ভারতে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মনে বৃটিশ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সৃষ্ট হইল তিক্ত মনোভাব। মহারাষ্ট্রের পুণা নগরীতে চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন মহারাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়। মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে প্রকাশমান। পেশোয়াগণের উদ্ভব হইয়াছিল এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী হইতে এবং নানা ফারনবীশ, তিলক,

গোখলে, রাণাড়ে, পরাঞ্জপে, চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি বহু বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। ইংরাজগণ বস্তুতঃপক্ষে এই ব্রাহ্মণ-বংশের সহিতই লড়াই করিয়া মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজ-বিদ্বেষ এই দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ-বংশের অস্থি-মজ্জায় বর্ত্তমান ছিল এবং তাঁহারা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর নীতি ও কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসবান্। শিবাজীর আদর্শ লইয়া পুণা, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও নাসিক ইত্যাদি স্থানে ধীরে ধীরে বহু সমিতি ও মেলার উদ্ভব হইতে লাগিল। ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি-উৎসব মহা ধুমধামের সহিত উদযাপিত হইতে আরম্ভ হইল। গণপতি-উৎসবে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, মশাল ইত্যাদি লইয়া এক-একটি শোভাযাত্রা বাহির হইত। ১৮৯৫ সাল হইতে ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম ও রাজ্যাভিষেক-উৎসব অতিশয় আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এবং মন্ত্রগুপ্তির শপথ এই সকল উৎসবে গ্রহণ করা হইত। বৃটিশ-বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও গান প্রচার এই সকল উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। গীতায় উল্লিখিত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ বিপ্লবীদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইত। মজ্জিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনেতিহাস এবং আয়ার্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গুপ্ত বিপ্লবান্দোলন তাঁহাদিগকে দিত কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ।

দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক পুণার সম্ভ্রান্ত চিৎপাবন বংশোদ্ভূত দুই ভ্রাতা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুধর্ম্মের অন্তরায়-অপসারণ-সমিতি" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। জনগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান এবং অস্ত্র-সাহায্যে শত্রুদের বিনাশ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই উৎসাহে এই

সমিতি কর্ত্তৃক ১৮৯৫ সাল হইতে শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট-হত্যা

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। এই মহামারীকে উপলক্ষ করিয়া বে-সামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীরা দুর্ব্বিসহ অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করিল—যাহার ফলে জনসাধারণের চিত্ত হইয়া উঠিল বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। প্লেগ দমনকল্পে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্লেগ-কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্ষ্ট ছিলেন ঐ কমিটির একজন সদস্য। ইউরোপীয় সৈন্যগণ উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিল, তাহা ছিল এদেশীয় লোকাচার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সম্পর্কে মহিলাগণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয়ও শুনা যাইতে লাগিল। হাইকোর্টের জজ রাণাড়ে মহাশয় এই সকল অনাচার ও অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতে গোখলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য গোখলে ও দীনশা ইদল্‌জী ওয়াচা তখন বিলাত গিয়াছিলেন। রাণাড়ের প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গোখলে বিলাতে কতকগুলি অভিযোগের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন। তাহার ফলে ভারতের বৈদেশিক শাসক-বর্গ তাঁহার উপর হইলেন রুষ্ট এবং গোখলে জাহাজযোগে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির হইল। গোখলে ও ওয়াচা যখন ভারতের পথে এডেনে উপনীত হইলেন, তখন কোনও হিতৈষী ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণেই ওয়াচাকে গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের

বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ওয়াচা ও গোখলে পরামর্শ করিয়া তখন রাণাড়ের পত্রগুলি করিলেন অগ্নিদগ্ধ ; কারণ ঐরূপ না করিলে ঐ তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে রাণাড়েকেও জড়িত হইয়া পড়িতে হইত। তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর যখন বোম্বাই নগরে পৌঁছিল, তখন পুলিশের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রুটি স্বীকারের দ্বারা গোখলে পরিত্রাণ পাইলেন। ত্রুটি স্বীকার না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না ; কারণ রাণাড়ের পত্রগুলি অগ্নি-দগ্ধ করিতে হওয়ায় অভিযোগ প্রমাণের সকল তথ্যই নষ্ট হইয়াছিল।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তখন মহারাষ্ট্রের সর্ব্বজনপূজ্য নেতা এবং তাঁহার সম্পাদনা ও পরিচালনায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "কেশরী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহু উত্তেজনাপূর্ণ বচনা ইহাতে স্থান পাইত এবং অস্ত্রবলে শত্রু-উৎসাদনের বিষয়ে জনসাধারণকে ইহা উৎসাহিত করিত। প্রকৃতপক্ষে তখন "কেশরী" পত্রিকাই চরম ও বিপ্লব-পন্থীদের হইয়া উঠিয়াছিল মুখপত্রস্বরূপ। ঐ পত্রিকাখানি বিপ্লবীদের সকল কার্য্যেই সমর্থন জানাইত।

১৮৯৭ সালে প্লেগের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের অনাচারের মাত্রা যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন প্লেগ রেগুলেশনের অত্যাচার লইয়া "কেশরী" পত্রিকায় চলিতে লাগিল উহার কঠোর সমালোচনা। উহাতে লিখিত হইল,—"নগরে নর-রূপী প্লেগের অত্যাচার অপেক্ষা প্লেগ আমাদের নিকট বহুগুণে উত্তম।" ঐ সালেরই জুন মাসের ১৩ই তারিখে তিলকের সভা-পতিত্বে যে শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে তিলক এক উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। উক্ত উৎসব ও সভার বিবরণ ১৫ই জুনের "কেশরী"তে প্রকাশিত হইল এবং লিখিত প্রবন্ধে সকলকে দেশের শত্রু-নিধনকল্পে শিবাজীর আদর্শ অনুকরণ করিতে আহ্বান জানান হইল। প্রকৃতপক্ষে ইহা বৃটিশেরই বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান।

ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। ২২শে জুন—১৮৯৭। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষষ্টিতম বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে সেইদিন হীরক জুবিলীর আয়োজন হইয়াছিল। বড় বড় নগরগুলি সেইদিন রাত্রিকালে হইল আলোকমালায় সজ্জিত। উৎসবানুষ্ঠানের পর বোম্বাইয়ের লাট-ভবন হইতে মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট সাহেব রাত্রিকালে যখন ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন, তখন দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের হস্তে তাঁহারা দুইজন প্রাণ হারাইলেন। দামোদর চাপেকার কর্ত্তৃক বোম্বাইয়ে অবস্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর-মূর্ত্তিটিও আলকাতরা লেপনে বিকৃত হইল।

আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দামোদর চাপেকারের প্রাণদণ্ড হইল। "কেশরী" পত্রিকায় ১৫ই জুনের প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের হইল দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ। এই সকল আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে পুণার নাটুভ্রাতৃদ্বয়ও নির্ব্বাসিত হইলেন।

১৮৯৮ সালে শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের সম্পাদনায় "কাল" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা এবং "বিহারী" নামে অপর একখানি জাতীয় পত্রিকা রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইল।

ইহার পর ১৮৯৯ সালে পুণার চীফ কনষ্টেবলকে হত্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইল—তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। গোয়েন্দাগিরি করিয়া যে দুইটি ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহারা অকস্মাৎ নিহত হইল। এই সকল হত্যাকাণ্ডের ফলে চাপেকারভ্রাতৃদ্বয়-প্রতিষ্ঠিত সমিতির চারিজন সদস্যের হইল ফাঁসি ও একজনের হইল দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কয়েক বৎসর পরে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা নামক

কাথিয়াবাড়ের এক ব্যক্তি বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমন করিলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেখানে India Home Rule Society নামক একটি সমিতি গঠন করিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য হইতে উক্ত সমিতির সদস্য-সংগ্রহ চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় "Indian Sociologist" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যাহাতে ভারতীয় ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক ইত্যাদি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এক হাজার টাকা হিসাবে কয়েকটি বৃত্তি দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

নাসিকনিবাসী ২২ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকর শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার ঐ বৃত্তি লইয়া ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া India Home Rule Society-র সভ্য হইলেন। পুণার ফারগুসন কলেজ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কিন্তু অধিক দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়া হাউসকে বৃটিশ সরকার সুনজরে দেখিতেন না। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিলাতে থাকা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি প্যারীতে চলিয়া গেলেন।

ছাত্র-জীবনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর "মিত্র-মেলা" নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত সমিতির নাম "অভিনব-ভারত" (Young India) রাখিয়া উক্ত সমিতিটিকে নূতনভাবে সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে পুণার ছাত্রদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির সভাপতি-পদেও তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্যারীতে চলিয়া যাইবার পর ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচালনার ভার সাভারকরের উপরই পড়িল। ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্যেরা রিভলবার চালনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওয়াইলী সাহেবের জীবন-নাশ

বিনায়কের ভ্রাতার নাম গণেশ সাভারকর। একখানি রাজ-দ্রোহাত্মক পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৯০৯ সালের ৯ই জুন নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাক্‌সন কর্ত্তৃক গণেশ সাভারকর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই লণ্ডনে এক চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। মদনলাল ধিংড়া নামক এক ব্যক্তি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্য ছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌সটিটিউটের একটি সভার অধিবেশনকালে মদনলাল ধিংড়া তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লির A. D. C. কর্ণেল সার উইলিয়াম কার্জ্জন ওয়াইলীকে ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেন। ওয়াইলীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডাঃ লালকাকাও নিহত হইলেন। গ্রেপ্তারের সময় ধিংড়ার পকেট হইতে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে তাঁহার এইরূপ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে, ভারতীয় তরুণদের প্রতি প্রদত্ত কারা ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদস্বরূপ একান্তভাবে নিজেরই ইচ্ছায় তিনি ইংরাজ-রক্তপাতের চেষ্টা করিলেন!

২৩শে জুলাই লর্ড এনভারষ্টোনের আদালতে ধিংড়ার বিচার নিষ্পন্ন হয় এবং ঐ তারিখেই তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ড প্রদত্ত হয়। রায় শুনিয়া সামরিক কায়দায় তিনি বিচারপতিকে সেলাম জানাইয়া বলিলেন,—

"Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country."

একজন ভারতীয়ের দ্বারা খাস লণ্ডন সহরে প্রকাশ্য সভায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার ভারতীয়-সম্প্রদায় প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সভা আহ্বান করিয়া তাঁহারা এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবেন। তদনুযায়ী ৫ই জুলাই লণ্ডনে কাকস্‌টন হলে একটি সভা আহ্বান করা হইল, কিন্তু সেই সভায় ওয়াইলী-হত্যার নিন্দাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মত হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে বিনায়ক দামোদর সাভারকর দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিতেছেন। ইহার পরই বিনায়কের উপর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ হইল। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া কোনও মতে তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ জাহাজযোগে বোম্বাই পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল।

দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের নিকট জাহাজখানি উপস্থিত হইলে সাভারকর এক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। জাহাজের স্নানকক্ষের ছিদ্রপথ দিয়া তিনি সমুদ্রের বক্ষে দিলেন লাফ। তৎক্ষণাৎ জাহাজের উপর হইতে রক্ষীরা তাঁহার উপর গুলিবৃষ্টি করিতে সুরু করিল। দুর্জ্জয় সাহসে সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া জলের তলদেশে আত্মগোপন করিয়া তিনি সাঁতার কাটিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ফ্রান্সের তীরে গিয়া উঠিলেন। বৃটিশ পুলিশের নিকট তিনি ধরা দিলেন না—ধরা দিলেন ফরাসী পুলিশের হস্তে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশের হস্ত হইতে রেহাই পাওয়া; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইল না। ফরাসী পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশ পুলিশেরই নিকট অর্পণ করিল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁহার বিচার নিষ্পন্ন করাইবার জন্য ইহার পর বহু আন্দোলন হয়—কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। বোম্বাইয়ের আদালতেই তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে এইভাবে তাঁহার জীবনের অমূল্য চৌদ্দটি বৎসর আন্দামানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত রাজবন্দী হিসাবে আরও চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয় তাঁহাকে রত্নগিরিতে।

জ্যাক্‌সন-হত্যা

বিলাতে থাকাকালে সাভারকর প্যারী হইতে কুড়িটি Browning Automatic পিস্তল বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কিছুদিন পরে গণেশ সাভারকরের মামলার বিচারক নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাক্‌সন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। জ্যাক্‌সন-হত্যার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ একটি ব্যাপক ষড়্‌যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মামলা রুজু করিলে বিচারে তিনজনের ফাঁসি হইল। ইহার পরই নাসিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। সেই মামলায় প্রকাশ পাইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ "অভিনব-ভারত" সমিতির সদস্য—যাহার সহিত বিনায়ক সাভারকরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে বিস্ফোরক দ্রব্য-প্রস্তুতের যে ফর্ম্মুলা টাইপ করা হইয়াছিল, তাহার একটি কপিও গণেশ সাভারকরের বাড়ী হইতে পাওয়া যায়। এই ষড়্‌যন্ত্র মামলায় সাতাশজনের কারাদণ্ড হইল। সাতারা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থানের ষড়্‌যন্ত্রও ফাঁস হইয়া গেল।

বাংলায় বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত

বাংলা দেশে বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। এই আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকবারই কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু কোনটিই বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

না পারার কতকগুলি কারণও ছিল—তন্মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব অন্যতম। কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় সমিতিগুলির কার্য্যে তেমন শৃঙ্খলা ছিল না—এক দলের সহিত অপর দলের পারস্পরিক সহযোগিতার ছিল একান্ত অভাব। এইভাবেই কিছুদিন ধরিয়া বাংলা দেশে কিছু কিছু বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বরোদার রাজ-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। বহুদিন ইংলণ্ডে কাটাইয়া আসিয়া উক্ত কার্য্যে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বরোদায় যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন তরুণ বাঙ্গালী উক্ত ষ্টেটে সেনা-বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। সেইখানেই অরবিন্দের সহিত যতীন্দ্রের পরিচয় হইল। পুণার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান হইতে অরবিন্দ বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিলকের সহিতও তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। অরবিন্দের নিকট হইতে সরলা দেবীর নামে একখানি পত্র লইয়া বরোদার মহারাজার শরীর-রক্ষীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া ১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা। যুবকদের অন্যতম প্রধান নেতা ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের সহায়তায় তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার নিকটে ১০২ নং সার্কুলার রোডে একটি গুপ্ত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন।

ইহার পর যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবের বাণী প্রচারে ব্রতী হইলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কার্য্যরত বহু গুপ্ত-সমিতির দ্বারা বহু সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছে; বাঙ্গালীরা যদি

উপযুক্ত সময়ে তাহাদের ন্যায় প্রস্তুত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে যোগ্য স্থান ও মর্য্যাদা লাভে তাহারা সক্ষম হইবে না। সর্ব্ব-ভারতীয় বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য অবিলম্বে তাহাদের প্রস্তুতি আবশ্যক। অরবিন্দ শীঘ্রই বাংলায় আসিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব লইবেন বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিলেন।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আসার কয়েক মাস পরে অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলায় আসিলেন। তাঁহারও আগমন ঐ একই উদ্দেশ্যে। অরবিন্দও ঐ সালে একবার বাংলায় আসিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া কতকগুলি পুস্তক লইয়াই সার্কুলার রোডের বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী ও রাজনীতির ক্লাস খোলা হইল।

অনুশীলন-সমিতি, যুগান্তর দল ইত্যাদি কয়েকটি দলই তখন অন্য দলগুলির মধ্যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিল। উক্ত সমিতিগুলির কার্য্যকরী প্রচেষ্টায় কলিকাতার নানা স্থানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নানা শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এই সমিতিগুলির শাখা পল্লী-অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে। বাহিরে শরীর-চর্চ্চার দ্বারা সুস্থ-সবল দেহ-মন গঠন এবং ভিতরে ভিতরে অতি সংগোপনে বিপ্লবের বাণী প্রচারই এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ছিল। কর্ম্মী ও বিপ্লবী সংগ্রহ করা হইত অতিশয় সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত, কারণ বিন্দুমাত্র অসাবধানতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে সমগ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান ছিল। লোকের মনে বিপ্লববাদ জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবাত্মক নানাবিধ পুস্তিকাও প্রচারিত হইতে লাগিল।

বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কীয় একটি ঘোষণার ফলে যেন বিপ্লবীরা এই সময় অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বাংলা প্রদেশই শিক্ষা-দীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী এবং বাংলা দেশ হইতে উত্থিত দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই সমগ্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিতেছে; সুতরাং ভারতে যদি বৃটিশ-সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে বৃহৎ বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই সাধু সঙ্কল্প অন্তরে লইয়াই ঝানু রক্ষণশীল লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা তখন এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামকে একত্রিত করিয়া আর একটি নূতন স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টির অভিপ্রায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কার্জ্জন সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করিলেন। এই সর্ব্বনাশা প্রস্তাব শুনিবামাত্র দেশের জনসাধারণ যেন চকিত হইয়া উঠিল। বৃটিশ কূটনীতিবিদ্‌দের এই নূতন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং প্রায় সকলেই একবাক্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু এত বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জ্জন তাঁহার দুর্জ্জয় জিদ ত্যাগ করিলেন না। এ দেশের জনমতের বিন্দুমাত্র মূল্য তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি ছিলেন সর্ব্বপ্রকার প্রগতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী। ভারতীয়দিগকে দমন করিয়া খর্ব্ব করাই ছিল তাঁহার মূল নীতি। তাঁহার আমলে ১৮৯৯ সালে নূতন আইন রচনা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। ১৯০৪ সালে তিনি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। নূতন পুলিশ আইনে তিনি পুলিশ-বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাঁহারই দ্বারা গোয়েন্দা-বিভাগের সৃষ্টি হয়।

লর্ড কার্জ্জনের মতে ভারতবাসীরা ছিলেন উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতবাসীদিগকেই নহে—সকল এশিয়াবাসীকেই তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় তিনি এশিয়াবাসীদিগকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও অসৎ বলিয়া মত প্রকাশ করেন; সুতরাং এ হেন দাম্ভিক কার্জ্জনের নিকট বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে এই সময় বুঝান হইতে লাগিল যে, এই বিভাগ দ্বারা তাঁহাদের অত্যন্ত সুবিধা হইবে।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে ভারত-সচিব সম্মতি দান করেন এবং ১৬ই অক্টোবর এই স্বতন্ত্রীকরণ সংঘটিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় দেশবাসী বুঝিতে পারিল যে, মুখের কথায় আর কোনও কাজ হইবে না—হাতে-কলমে অচিরেই কিছু করা দরকার। ভারত-শাসনের ব্যাপারে বৃটিশের ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ আর একবার যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙ্গালারা মনে করিয়াছিলেন, বাংলার এই অপমানকে জাতীয় কংগ্রেস একটি সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যাপার এবং সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। আবেদন-নিবেদনের সহজ সরল পন্থা ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দায়িত্ব লইতে নরমপন্থীরা প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ইহা লইয়া মত-বৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিল এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া দুই দলে বেশ একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখনকার চরমপন্থীদের মধ্যে লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়, মুঞ্জে, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির নাম

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে নরমপন্থীরা একটা মিটমাটের আশায় সর্ব্বজনমান্য নেতা দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে লইয়া আসিলেন এবং ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনিই করিলেন সভাপতিত্ব। উক্ত অধিবেশনে ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে সেইবারই সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হইল—স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে "বয়কট আন্দোলন" চালান যাইতে পারিবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

নানা সভা-সমিতিতে ইহার পরই আরম্ভ হইল তীব্র ভাষায় বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জ্ঞাপন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সমগ্র দেশময় যেন আগুন ছড়াইতে লাগিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন সারা দেশে অল্পদিনেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিবাদস্বরূপ নানাস্থানে হরতালও পালিত হইতে লাগিল।

দুইটি আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাও এই সময় জনগণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে বুয়রদের সাফল্য এবং ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে বৃহৎ রাশিয়ার পরাজয় তাহাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

নেতৃগণ এই সময় উপলব্ধি করিলেন যে, বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই বিষয়ে ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ হইলেন অগ্রণী। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ইত্যাদির অর্থানুকূল্যে ইহার পর National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ বরোদা রাজ্যের মোটা মাহিনার চাকুরী ত্যাগ করিয়া অতি অল্প বেতনে ইহার অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বাংলায় আসিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহা ক্রমশঃ একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল। বিপ্লবীদেরও ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। এই প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া দ্রুত নিজেদের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইবারের আন্দোলনে ছাত্রসমাজই বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই ছাত্রসম্প্রদায় হইতেই বিপ্লবীরা প্রধানতঃ সদস্য ও কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ছাত্রদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় এবং আদেশ অমান্যকারীদিগকে বেত্রাঘাত করা অথবা স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া চলিতে থাকে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল ধন-ভাণ্ডার খোলা হইল এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ রাখী-বন্ধন উৎসবের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের নূতন লেঃ গভর্ণর সার ব্যামফিল্ড ফুলার সকলকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া ঘোষণা করিলেন, আন্দোলন দমন করিবার জন্য "bloodshed may be necessary" এবং প্রকাশ্যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করা আদেশ-জারি করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় "যুগান্তর" দল এবং ঢাকায় "অনুশীলন-সমিতির" প্রভাব ছিল খুব বেশি। "অনুশীলন-সমিতি" প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। বিপিন পাল ও ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি, মিত্র) একবার ঢাকায় গিয়াছিলেন। পি, মিত্র ছিলেন সর্ব্বদাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী। সেখানে পরামর্শের পর স্থাপিত হয় একটি বিপ্লবী দল এবং উকিল আনন্দ চক্রবর্ত্তীর অধিনায়কত্বে ও পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় "অনুশীলন-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পি, মিত্রের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাতেও "অনুশীলন-সমিতি" গঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর

"অনুশীলন" প্রবন্ধ হইতেই নাকি সমিতির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অপরপক্ষে ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক উপন্যাসের নাম হইতে অপর বিপ্লবী দলটির নামকরণ হইয়াছিল "যুগান্তর"।

যে সকল পুস্তিকা এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত হইত, তাহার কয়েকখানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ লিখিত "ভবানী-মন্দির" ও "No Compromise," সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" ও "মুক্তি কোন্ পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" ইত্যাদি পুস্তিকাসমূহ বিপ্লবীরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। "আনন্দ-মঠ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থও বিপ্লবীদিগের প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী বিপ্লবীদিগকে এতই প্রভাবিত করিয়াছিল যে, এই সময়কার বহু বিপ্লবীও সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেন এবং ঐরূপ বেশেই অনেকেই পুলিশের হাতে ধরাও পড়িয়াছিলেন! বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ বিপ্লবীদের মনে জাগাইয়া তুলিত বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস।

বিপ্লববাদকে সমর্থনকারী কতকগুলি সংবাদ-পত্রেরও এই সময় উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় "সন্ধ্যা"য়, অরবিন্দ "বন্দে-মাতরম্"-এ এবং বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি "যুগান্তর" পত্রিকায় সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বাঙ্গালাদের এই জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড দমন-নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। সুপ্রাচীন বিভেদ-নীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হইল। ১৯০৬ সালে যখন দাদাভাই

নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছিল, তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগে মস্লেম লীগের সৃষ্টি হয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কৌশলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ; চতুর্দ্দিকে ইহা প্রচারিত হইল যে, হিন্দু-দলনের পশ্চাতে মুসলমানদের প্রতি ভারত-সরকারের সমর্থন আছে এবং হিন্দুদের দোকান-পত্র লুণ্ঠন ও নারী-হরণে (বিশেষ করিয়া বিধবা) সরকার শাস্তি দিবেন না। নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট সার ব্যামফিল্ড ফুলার নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিলেন—মুসলমানগণ তাহার "সুয়োরাণী"।

ফল যাহা হইবার—তাহাই হইল ! প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিশেষ করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ কিছুদিন যাবৎ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি নেতারা ইহাতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন "Purification by blood and fire"—নীতিতে বিশ্বাসী। ইহা ব্যতীত যে দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না—তাহা তিনি জানিতেন। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে তিনি লিখিলেন—"If our people do not lift their finger or court death when seeing women violated before their eyes, they have morally ceased to exist. Long subjection has crushed the soul and left the mere corpse."

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টও পীড়নের মাত্রা বর্দ্ধিত করিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রচার করিতে লাগিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী। দাদাভাই নৌরজীর ব্যাখ্যাত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্ত্তে, ইংরাজ-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের দাবী বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন ; সুতরাং তাঁহার মতে কেবল বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিলেই চলিবে না, বিদেশী শাসনকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা চাই।

১৯০৭ সালে গভর্ণমেণ্ট সংবাদ-পত্র দলনে তৎপর হইলেন। ঐ সালের ২০শে জুলাই তারিখে "যুগান্তর"-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজ-দ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার মাত্র কিছু দিন পরেই তুইটি অনুরূপ প্রবন্ধ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই মামলা পরিচালনার ভার পড়িল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর এবং বিপিন পাল ছিলেন এই মামলার একজন সাক্ষী। আদালতে বিপিনবাবু শপথ গ্রহণে অথবা কোনও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীকৃত না হওয়ায় মামলা ফাঁসিয়া গিয়া অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। বিপিনবাবু কিন্তু রেহাই পাইলেন না। আদালত অবমাননার দায়ে ২৬শে আগষ্ট, ১৯০৭ সালে তাঁহার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

বিপিনবাবুকে কারাদণ্ড প্রদানের দিন আদালতে বিপুল জনসমাগম হওয়ায় পুলিশ জনতা নিযন্ত্রিত করিতে তাহাদের উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি চালায়। ই, বি, হুই নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সেই সময় সুশীল সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক বিপ্লবীকে এক ঘা ঘুসি মারে। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুশীলও উত্তেজিত হইয়া ঐ কর্ম্ম-চারীকে পাল্টা ঘুসি মারিয়া বসে। সুশীল তৎক্ষণাৎ ধৃত ও অভিযুক্ত হয়। কলিকাতার তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড তৎপরদিন উক্ত অপরাধে বালকটির প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং সেই দিনই সুশীলকে শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

১৯০৭ সালের শেষভাগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত "সন্ধ্যা" পত্রিকায় "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়" নামক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। আদালতে ব্রহ্মবান্ধব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিধাতার নির্দ্দিষ্ট স্বরাজলাভের প্রচেষ্টায় তিনি যে সামান্য অংশ গ্রহণ

করিয়াছেন, তাহার জন্য কোনও বিদেশী সরকারের নিকট কোনও কৈফিয়ৎ তিনি দিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে কারাদণ্ড প্রদান করা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত এবং মামলায় তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। মামলা বিচারাধীন থাকা কালেই অন্ত্রে অস্ত্রোপচারের

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

পর ব্রহ্মবান্ধব পরলোকগমন করেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সত্যই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যে কুলায় নাই।

১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা-দমন-আইন প্রণয়ন

করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ভারত-সচিব মর্লি এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় জানাইলেন,—"The Government have been obliged to take measures of repression ; they may be obliged to take more."

কলিকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুর বাগানে একটি বড় রকমের গুপ্ত বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র বসু, উল্লাসকর দত্ত ইত্যাদি নেতাগণ এই কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেমচন্দ্র দাস ছিলেন মেদিনীপুরের একজন বিপ্লবী এবং তিনি ১৯০৬ সালে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন বোমা তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত করিতে। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া মুরারিপুকুর বাগান-কেন্দ্রে যোগদান করেন। চন্দননগর ও রাজাবাজারেও বোমার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী এবং পিস্তল ও রিভলবার সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল।

এ দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গের বিষয় ঘোষণায় ইতি-পূর্ব্বেই যেন বাংলার যুব-শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল। তাহার উপর চলিতেছিল 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা'র মত মধ্যে মধ্যে শাসনকর্ত্তাদের দম্ভোক্তি। অত্যাচার-উৎপীড়নও ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। সমগ্র পরিস্থিতিটাই বিপ্লবীদের নিকট দুর্ব্বিসহ হইয়া দাঁড়াইল। সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ এবং বক্তৃতা-দমন আইনের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপায়ও অবশিষ্ট ছিল না। অনন্যোপায় যুব-শক্তি তখন রক্তদান ও রক্তপাতের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

১৯০৬ সাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী ছোট লাট ফুলার সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু সাফল্যলাভ

সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা ও সমর্থক ছিলেন বিভক্ত পশ্চিম বঙ্গের ছোটলাট সার অ্যানড্ ফ্রেজার। বিপ্লবীদের ক্রোধটা তাহার পর তাঁহারই উপর পড়িল। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে চন্দননগরের নিকটে উল্লাসকর দত্তের তৈয়ারী বোমায়

হেমচন্দ্র দাস

তাঁহার ট্রেণ উড়াইয়া দিবার প্রথম চেষ্টা হইল। সে প্রচেষ্টা সফল হইল না। ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংসের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন তিনি ট্রেণে চাপিয়া মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। নারায়ণগড় ষ্টেসনের নিকটে বিপ্লবীরা ট্রেণের উপর বোমা

নিক্ষেপ করিয়া উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলেন। বোমার আঘাতে ট্রেণের কয়েকখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া গেলেও ফ্রেজার সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন।

এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদিগকে ধরিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করিয়া উহাকে চাপা দিবার জন্য অবশেষে জনকয়েক কুলীকে ধরিয়া স্বীকারোক্তি করাইয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়া হয়।

ঐ সালেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার পূর্ব্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে হত্যা করিবার জন্য গোয়ালন্দ ষ্টেশনে দিনের বেলায় তাঁহার উপর রিভলবারের গুলি নিক্ষিপ্ত হইল—কিন্তু সে চেষ্টাও হইল ব্যর্থ। কুষ্ঠিয়ার পাদ্রী হিকেন সাহেবের উপর ইহার পর বিদ্রোহীরা গুলিবর্ষণ করেন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলার ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংস করিবার জন্য আর একবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা হইল।

চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দ্দিভিল চন্দননগরে স্বদেশী-সভার অনুষ্ঠানে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেন এবং ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র-আইন না থাকায় বিপ্লবীদের অস্ত্র-সংগ্রহের যে সামান্য সুযোগ ছিল, তাহা একটি অস্ত্র-আইন পাশ করিয়া রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ চন্দননগরের মেয়রের গৃহে ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। শিবপুরে একটি স্বদেশী ডাকাতিও এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয়।

কিংসফোর্ড-হত্যার ষড়যন্ত্র

মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বিপ্লবীদিগের ঘৃণা বহুদিন হইতেই সঞ্চিত ছিল। কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিবার সময় হইতেই একজন জবরদস্ত বিচারক হিসাবে তিনি কুখ্যাত

হইয়াছিলেন। তখনকার দিনের বহু রাজনৈতিক মামলার বিচার তাঁহার এজলাসেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং অভিযুক্তরা প্রায়ই কঠোর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্" এবং "সন্ধ্যা" পত্রিকার মামলার তিনিই ছিলেন বিচারক। রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছাত্রগণকে তাঁহার নিকট প্রায়ই বেত্রদণ্ড লাভ করিতে হইত। সুশীল সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক বালকের তাঁহার নিকট বেত্রদণ্ড লাভের কাহিনী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বাস্তবিকই বিচারক হিসাবে মিঃ কিংসফোর্ডের আদেশ-নির্দ্দেশ বিচারালয়ের ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার মহিমা ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। রৌলট কমিটিও তাঁহাদের রিপোর্টে মিঃ কিংসফোর্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"We must congratulate Mr. Kingsford for his escaping from the aim of Khudiram Bose. Mr. Kingsford's doing as Presidency Magistrate, Calcutta, were both outrageous and satanic."

এই সকল কারণে বিপ্লবীরা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই মিঃ কিংসফোর্ড বদলী হইয়া মজঃফরপুরে যান; সেখানে গিয়াও তিনি কিন্তু রেহাই পাইলেন না—বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার পিছু লইলেন। মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যা-প্রচেষ্টায় যে দুইটি নাম অক্ষয় হইয়া আছে—সে দুইটি নাম শহীদ প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুর।

শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বগুড়া জিলার অন্তর্গত বিহার গ্রামে প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী

এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। মাত্র দুই বৎসর বয়সের সময় প্রফুল্ল-এর পিতৃবিয়োগ হয়।

বিহার গ্রামের পার্শ্বে নামুজা গ্রাম। উক্ত গ্রামের মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রফুল্ল-এর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। লেখা-পড়ায় তাঁহার মনোযোগ থাকিলেও খেলাধূলাতেই তিনি অধিকতর উৎসাহ বোধ করিতেন। মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি রংপুর সহরে যান এবং সেখানকার জেলা-স্কুলে ভর্ত্তি হন।

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রাক্কালে দেশ-মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহার ঢেউ গিয়া রংপুরেও লাগিল। রংপুরের এই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রফুল্ল চাকা ছিলেন ছাত্রদের নেতা এবং গুপ্ত-সমিতির সহিত তিনি ছিলেন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। স্বদেশী সভায় যোগদানের অপরাধে রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একবার জেলা-স্কুলের ছাত্রগণের পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করেন। ইহার ফলে প্রফুল্ল এবং আরও অন্যান্য বহু ছাত্র জেলা-স্কুল ত্যাগ করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণর সার ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করিবার আয়োজনে ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যখন রংপুরে যান, তখন প্রফুল্ল চাকীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরেশচন্দ্র মৌলিক এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত নামক অপর দুইজন সহপাঠীর সহিত ইহার কিছুদিন পরে প্রফুল্ল কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার গুপ্ত-সমিতিতে প্রবেশলাভ করেন। পরেশচন্দ্র ও নলিনীকান্ত পরবর্ত্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে সময়—সেই

সময়ের মধ্যে প্রফুল্ল বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে যোগদান করিয়াছিলেন। ফুলার-হত্যার উদ্যোগ-আয়োজন নেহাৎ সামান্য ব্যাপার ছিল না—তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের অভাব মিটাইবার জন্য রংপুর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে এক ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়। স্থির হইয়াছিল যে, নরেন্দ্র গোস্বামী, হেমচন্দ্র দাস, প্রফুল্ল চাকী ও পরেশ-চন্দ্র মৌলিক প্রভৃতি সেই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর ডাকাতি করা সম্ভব হয় নাই ; কারণ ঘটনাচক্রে সেখানকার থানার দারোগা ডাকাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতেই কার্য্যবশতঃ উক্ত গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই ডাকাতির পরিকল্পনা ফাঁসিয়া গেল।

ফুলার সাহেবকেও বধ করা শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। বিপ্লবীরা সংবাদ রাখিয়াছিলেন যে, ফুলার সাহেবের ট্রেণ রংপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইবে। তাঁহারা স্থির করিলেন, উক্ত ষ্টেসনেরই খানিকটা দূরে লাট সাহেবের ট্রেণ ধ্বংস করিয়া দিবেন। তদনুযায়ী লাইনের নীচে ব্যাটারীযুক্ত বোমা স্থাপিত হইল। আয়োজনের কোনও ত্রুটি বিপ্লবীরা এক্ষেত্রে রাখেন নাই। বোমা দৈবক্রমে না ফাটিলেও ফুলার সাহেব যাহাতে পরিত্রাণ না পান—তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। রিভলবার ও লাল লণ্ঠন লইয়া অপর একজন সঙ্গীসহ প্রফুল্ল ষ্টেসনের নিকট অপেক্ষা করিবেন বলিয়া ঠিক হয়। বোমা না ফাটিলে লাটসাহেবের ট্রেণখানি যদি নিরাপদে নির্দ্দিষ্টস্থল অতিক্রম করিয়া আসে, তাহা হইলে সে অবস্থায় প্রফুল্ল ষ্টেসনের নিকটে ট্রেণখানিকে লাল আলো দেখাইবেন এবং ইহাতে বিপদ্জ্ঞান করিয়া ট্রেণ-খানি যখন থামিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে, তখন রিভলবারসহ ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লর পক্ষে ফুলার-হত্যা অসম্ভব হইবে না। ধুবড়ী হইতে লাট সাহেবের ট্রেণখানি রংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেই যাহাতে খবর পাওয়া যায় সেইজন্য টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়া একজন

বিপ্লবীকে পাঠান হইয়াছিল ধুবড়ীতে; কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। রংপুর না গিয়া বিপ্লবীদের ফাঁকি দিয়া ফুলার সাহেব গোয়ালন্দ হইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং শীঘ্রই চলিয়া গেলেন বিলাতে। রংপুর-গোয়ালন্দ-কলিকাতায় পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও বিপ্লবীদিগকে ফুলার-হত্যায় নিরাশ হইতে হইল।

এইরূপে দেখা যায় যে, তখনকার দিনের অনেকগুলি বড় বড় কাজে প্রফুল্ল উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণগড়ে অ্যানড্ ফ্রেজারের ট্রেণ ধ্বংসের প্রচেষ্টায় এবং আরও কতকগুলি স্বদেশী ডাকাতিতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া প্রফুল্লের কর্ম্মকুশলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছিল এবং বিশ্বাসী ও দক্ষব্যক্তি হিসাবে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য বারীন্দ্রকুমারের দ্বারা তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরামের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার মেদিনীপুর সহরের উত্তরস্থ হবিবপুরে। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোল রাজ-কাছারীর তহশীলদার। ক্ষুদিরামের জননীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার দুইটি ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ত্রৈলোক্যনাথের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না—ছিলেন কেবলমাত্র তিনটি কন্যা। ক্ষুদিরামের জন্মের পরই সেইজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়া তাঁহাকে কিনিয়া লইয়াছিলেন—তাহার ফলে তাঁহার নাম হইয়াছিল ক্ষুদিরাম। শৈশবেই ক্ষুদিরাম পিতৃ-মাতৃহীন হইলে তাঁহার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে

তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু লেখা-পড়ার অপেক্ষা খেলা-ধূলাতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল অধিক। ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায় যখন জজকোর্টের হেডক্লার্করূপে মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন সেখানে আসিয়া ক্ষুদিরামের বিপ্লবী-জীবনের সূত্রপাত হইল।

একবার মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে বাংলার ছোটলাট ক্ষুদিরামের ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উহার প্রতি আসক্ত হইয়া ১৯০৫ সাল হইতেই ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। মেদিনীপুরের বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর বিখ্যাত অধিনায়ক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তমলুকে ক্ষুদিরামের সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র সেন পরবর্ত্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথদের বাটীর সংলগ্ন একটি স্থানে বিপ্লবীদের গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ক্ষুদিরাম তাহার একজন সদস্য ছিলেন। বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম অক্লান্তভাবে কার্য্য করিতেন। দোকান হইতে বলপূর্ব্বক বিদেশী বস্ত্র ছিনাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা বহ্ন্যুৎসব করিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে পুরাতন জেলখানার প্রাঙ্গণে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম রাজদ্রোহাত্মক "সোনার বাঙলা" পুস্তিকা বিতরণ করেন। প্রবেশদ্বারে উক্ত পুস্তিকা বিতরণ করিবার সময় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে পুলিশের উপর তিনি ঘুসি চালান। সেই সঙ্কটজনক সময়ে সহসা সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে হাজির হন।

সত্যেন্দ্র দেখিলেন যে, ব্যাপার বড় গুরুতর। তিনি ছিলেন সেই প্রদর্শনীর সহকারী-সম্পাদক এবং মেদিনীপুর কালেক্টরির একজন

কেরাণী। পুলিশটি তাঁহাকে চিনিত। পুলিশের হাত হইতে ক্ষুদিরামকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ক্ষুদিরামকে ডেপুটিবাবুর পুত্র বলিয়া পুলিশের নিকট পরিচয় দেন এবং ইহার ফলে ভয় পাইয়া পুলিশটি ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দেয়।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই চাতুরী শীঘ্রই ধরা পড়িয়া গেল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে তখন জারি হইল গ্রেপ্তারী পরোয়াণা এবং কিছুদিন লুকাইয়া থাকার পর তিনি তাঁতশালায় ধরাও পড়িলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন ধরিয়া মামলা চলিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে এই মামলায় সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামের অনুকূলে সাক্ষ্যদান করেন। তাহার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ কেরাণীগিরি চাকুরিটি হারাইলেন।

গুপ্ত-সমিতির টাকার অভাব দূব করিবার জন্য ক্ষুদিরামের দ্বারা একটি স্বদেশী ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে পূজার সময় তিনি যখন হাটগেছ্যা গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে একদিন সন্ধ্যার সময় সেখানকার ডাকহরকরার মেলব্যাগ তিনি লুণ্ঠন করেন।

হেমচন্দ্র দাসের সহিত ক্ষুদিরামের পরিচয় হইয়াছিল অতিশয় অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে। হেমচন্দ্র একবার মেদিনীপুরের কোনও পথ দিয়া সাইকেলে চাপিয়া যাইতেছিলেন। বালক ক্ষুদিরাম সেই সময় তাঁহার নিকট একটি রিভলবার পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। দুইজনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই, সুতরাং একটি ক্ষুদ্র বালকের এই আকস্মিক অদ্ভুত প্রার্থনায় তিনি বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। ক্ষুদিরামকে তিনি উহা চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষুদিরাম বলিলেন,—"আমি একটা সায়েব মারতে চাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ একবার ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"তুই দেশের

জন্যে প্রাণ দিতে পারবি?" ক্ষুদিরাম তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় জানাইয়াছিলেন—তিনি পারিবেন।

এই হেমচন্দ্র দাস এবং সত্যেন্দ্রনাথের সুপারিশে ক্ষুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিবার জন্য প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গী নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মিঃ কিংসফোর্ড যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখনই একবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। একখানি মোটা বই-এর পাতা কাটিয়া মাঝখানে একটি গোল করিয়া গর্ত করা হয় এবং সেই গর্তের ভিতর একটি বোমা রাখিয়া পুস্তকের মলাট চাপা দেওয়া হয়। বইখানি উপহার পাঠান হয় কিংসফোর্ডকে। এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যাহাতে বইখানি খুলিলেই বোমা বিস্ফোরিত হইত; কিন্তু বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দেওয়া কিংসফোর্ডের ললাটলিপি নহে। সেইজন্য ভাগ্যক্রমে তিনি বইখানি না খুলিয়াই আলমারিতে উহা রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোনও বন্ধু বোধ হয় তাঁহারই নিকট হইতে গৃহীত পুস্তক পাঠ সমাপনান্তে তাঁহার নিকট ফেরত পাঠাইয়াছেন—সেইজন্য উহা খুলিয়া দেখা আর তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আলিপুর বোমার মামলা চলিতে থাকার সময় বিপ্লবীদের এই গুপ্ত-চক্রান্তের বিষয় ফাঁস হইয়া যায় এবং মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডের আলমারি হইতে বোমাসহ বইখানি উদ্ধার করা হয়।

বারীন্দ্রকুমারের রচনা হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যার বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের মধ্যে পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল না এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা পরস্পরের আসল নামও অবগত ছিলেন না। ক্ষুদিরাম ছদ্মনাম লইয়াছিলেন দুর্গাদাস সেন আর প্রফুল্ল চাকী নাম লইয়াছিলেন দীনেশচন্দ্র রায়। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে ঐ নামেই চিনিতেন।

৩২নং গোপীমোহন দত্তের লেনে হেমচন্দ্র দাস এবং উল্লাসকর দত্ত কাঠের হাতলযুক্ত একটি বোমা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমার উক্ত বাটীতে প্রফুল্লকে লইয়া গিয়া ঐ বোমাটি একটি ব্যাগে রক্ষিত করিয়া প্রফুল্লকে উহা প্রদান করেন এবং তৎপরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ৩৮।৫ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের বাটীতে লইয়া যান। হেমচন্দ্র দাস ও ক্ষুদিরামের সহিত সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে আবশ্যক উপদেশ দান করিয়া সেখান হইতেই তাঁহাদিগকে পাঠান হয় সুদূর মজঃফরপুরে।

তিনটি পিস্তল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। দৈবক্রমে বোমা নিষ্ফল হইলে তাঁহাদিগকে পিস্তল ব্যবহারের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

মজঃফরপুরের ঘটনা

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দুইজনকে বেশ কয়েকদিন মজঃফরপুরে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। সেখানে ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিবার সময় তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হয় এবং কলিকাতা হইতে মণিঅর্ডারে ২০৲ আনাইয়া লন। কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। কিংসফোর্ড সাধারণতঃ রাত্রি আটটার সময় প্রতিদিন ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া ক্লাব হইতে আপনার বাস-ভবনে ফিরিতেন; সুতরাং ঐ সময়েই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত করেন।

৩০শে এপ্রিল—১৯০৮ সাল। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ঘনান্ধকারে যথারীতি একখানি ঘোড়ার গাড়ী—দেখিতে যাহা ঠিক কিংসফোর্ডের গাড়ীরই অনুরূপ—নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিংসফোর্ডের বাটীর ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল অপেক্ষা

করিয়াই ছিলেন। গেটের একধার হইতে ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিবেন—এইরূপ ঠিক হইয়াছিল। বোমা না ফাটিলে দুইজনে গাড়ীর দুইদিক হইতে রিভলবার লইয়া একই সময়ে কিংসফোর্ডকে আক্রমণ করিবেন; কিন্তু গাড়ীখানি দ্রুত আগাইয়া আসায় আর বিলম্ব না করিয়া ক্ষুদিরাম বাংলোর গেটের একটু দূরেই একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রনিনাদে দিক-বিদিক প্রকম্পিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষ মধ্যে গাড়ীখানায় আগুন ধরিয়া গেল।

কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্য! সেই গাড়ীতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না—ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মি: কেনেডির নিরপরাধিনী পত্নী ও কন্যা। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহারা দুইজনেই গুরুতররূপে আহত হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের জীবন রক্ষা করা গেল না। কুমারী কেনেডি ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই এবং শ্রীমতী কেনেডি ২রা মে সকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সহিসের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল।

এদিকে বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত একত্রে দৌড়িয়া গিয়া তৎপরে পৃথক্ হইয়া গেলেন। রেল-লাইন ধরিয়া পদব্রজে উভয়েই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

ঘটনার পর ঢোল সহরতে সহরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, আততায়ীদের ধরাইয়া দিতে পারিলে অথবা তাহাদের কোনও সন্ধান দিতে পারিলে সরকার পক্ষ হইতে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

বহু পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুদিরাম অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনি ষ্টেশনে একটি মুদীর দোকানে পরদিন সকালের দিকে তিনি বিশ্রামলাভের আশায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের গল্প চলিতে-

ছিল। দুইজন পুলিশকে সহসা সেইদিকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম যখন স্থানত্যাগের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন একজন পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে নানারকম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। উত্তর পাইয়া তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা ক্ষুদিরামকে ধরিবার চেষ্টা করিল। সেই সময় প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ক্ষুদিরামের বড় পিস্তলটি গেল নীচে পড়িয়া এবং ছোট পিস্তলটিও পকেট হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বেই পুলিশ দুইজন তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। ১লা মে তারিখে সকালের দিকেই শ্রান্ত ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন।

মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল গিয়া সমস্তিপুরে পৌছিলেন এবং সেখান হইতে বস্ত্র ও জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিলেন। সমস্তিপুরের দূরত্ব মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল। মোকামা ঘাটের একখানি টিকিট কাটিয়া প্রফুল্ল যখন গাড়ীতে উঠিলেন, তখন তাঁহার হাব-ভাব ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সিংভূমের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু সন্দেহ হইল। তিনিও তখন ঐ ট্রেণেই নিজ কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া কথায়-বার্ত্তায় তিনি প্রফুল্লের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি একজন মস্তবড় দেশপ্রেমিক! প্রফুল্ল তাঁহার কপটতা বুঝিতে পারিলেন না। নানা আলাপে প্রফুল্লের প্রতি নন্দলালের সন্দেহ দৃঢ় হইল এবং একটি ষ্টেসন হইতে গোপনে তিনি প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ তারযোগে আনাইয়া লইলেন।

মোকামা ঘাটে পৌছাইয়া প্রফুল্ল যখন হাওড়ার টিকিট কাটিয়া ট্রেণে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নন্দলাল পুলিশকে আদেশ দিলেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য। প্রফুল্লের ইহাতে বিস্ময়ের আর

সীমা রহিল না। কারণ একটু আগেই তিনি নন্দলালের জিনিষ-পত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজে বহিয়া ষ্টেসনে আনিয়াছিলেন—আর ইহাই কিনা তাহার প্রতিদান! দারুণ ঘৃণায় প্রফুল্লের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল এবং আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি বাঙালী হ'য়ে আমায় ধরিয়ে দিচ্ছ?"

নিরুপায় হইয়া প্রফুল্ল দৌড়াইতে লাগিলেন। একজন পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেই তিনি ভীমবিক্রমে তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। তাহার পর পিস্তল বাহির করিয়া তিনি যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃথা চেষ্টা! চতুর্দ্দিক হইতে পুলিশের দল তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল একজনের দিকে গুলি ছুঁড়িলেন—কিন্তু উত্তেজিত হস্তে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি তাঁহার পদব্রজে কাটিয়াছে—তাহার উপর দুশ্চিন্তা। স্নানাহার হয় নাই—পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে। বিনা নিদ্রায় তিনি অবসন্ন ও ক্লান্ত। প্রফুল্ল দেখিলেন, তাঁহার পলাইবার কোনও উপায় নাই—একটা হেস্ত-নেস্ত তাঁহাকে এইখানেই করিতে হইবে। ইহা বুঝিয়া তিনি অবিচলিত চিত্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ধরা তিনি কিছুতেই দিবেন না। পুলিশকে যে কি করিয়া ফাঁকি দিতে হয়—তাহা তাঁহার মত অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণের ভাল করিয়াই জানা আছে; পুলিশকেও তিনি তাহা আজ সমঝাইয়া দিবেন।

সেই একই তারিখ—১লা মে, ১৯০৮—ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িয়াছিলেন। প্রফুল্লের পিস্তলের মুখ তাঁহার নিজের দিকেই ফিরিল, তাহার পর দুইবার উহা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট গোঙানী শুনা গেল এবং তাহারই মধ্যে একবার সুস্পষ্ট "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি! তাহার পর সবই শেষ! দুইটি গুলিই তাঁহার

কণ্ঠ ও মুখমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে। প্রথম শহীদ হওয়ার যে গৌরব—তাহা লাভ করিলেন প্রফুল্ল।

ক্ষুদিরামের দ্বারা প্রফুল্লের দেহ সনাক্তকরণের পর আরও তদন্তের জন্য তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্পিরিটের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তীকালে প্রফুল্লের সেই ছিন্ন মস্তক ৫৭-বি, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিটের বাটীতে ভূপ্রোথিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। উক্ত বাটীতে বর্ত্তমানে ডানলপ কোম্পানীর কার্য্যালয় অবস্থিত। আবার অনেকে বলেন যে, তাঁহার কর্ত্তিত মস্তক নাকি লালবাজার থানার কোনও অংশেই প্রোথিত করা হইয়াছিল।

ধরা পড়িবার পর ট্রেণে করিয়া ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে লইয়া আসা হইল। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। মুহুমুর্হু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে ট্রেণের কামরা হইতে ক্ষুদিরাম অবতরণ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার জবানবন্দী গৃহীত হইল।

ক্ষুদিরাম ধৃত হওয়ায় বিপ্লবীরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয় বহু গুপ্ত তথ্য জানিয়া ফেলিবে; কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কোনও খবরই পুলিশ ক্ষুদিরামের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয় ৮ই জুন এবং ১৩ই জুন তারিখে রায় প্রকাশিত হয়। এই বিচারকার্য্য চালাইবার জন্য বাঁকীপুরের অতিরিক্ত সেসন্‌স্ জজ মিঃ কার্ণডফ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিচারক নিযুক্ত হইয়া মজঃফরপুরে আসেন। বাঁকীপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ ম্যান্নুক এবং সরকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মামলা পরিচালিত করেন।

ক্ষুদিরামের পক্ষে প্রথমতঃ কোন উকিলই ছিলেন না। মজঃফরপুরের

উকিল কালিদাস বসু এবং রংপুরের উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি শেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন।

সশস্ত্র পুলিশে পরিবেষ্টিত অবস্থায় আদালতে আসিয়া মি কিংসফোর্ডও

প্রফুল্লচন্দ্র চাকী

এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম সেই সময় অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

নিক্ষিপ্ত বোমাতে দৈবক্রমে দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হওয়ায় ক্ষুদিরাম মনে মনে যথেষ্টই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মুক্তকণ্ঠে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল।

রায় শুনিয়া ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বিচারক ভাবিলেন যে, অবোধ বালক বোধহয় দণ্ডের গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে নাই। সেইজন্য তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার প্রতি প্রদত্ত দণ্ড তুমি বুঝতে পেরেছ?"

ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

তাঁহার ধীর স্থির ভাব লক্ষ্য করিয়া জজও যেন খানিকটা বিচলিত হইলেন। ক্ষুদিরামকে যেন খানিকটা আশ্বাস দিবার জন্যই তিনি জানাইলেন যে, নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে এই রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরাম হাইকোর্টে আপিল করিতে পারেন এবং বিনা খরচে রায়ের একটা নকল তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

ক্ষুদিরাম তখন কিছু বলিতে চাহিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় বিচারক আর তাঁহাকে কিছু বলিবার অনুমতি দিলেন না। বিচারক জানাইলেন, তাঁহার বক্তব্য তিনি জেলারের নিকট পরে নিবেদন করিতে পারেন। ক্ষুদিরাম তথাপি বলিলেন,—"আর কিছু নয়, শুধু বোমা তৈরীর কৌশলটা সকলকে জানিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।"

বিপদ্ বুঝিয়া জজ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি জেলে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন।

ইহার পর হাইকোর্টে আপিল ব্যর্থ হইল—ছোটলাটের নিকট আবেদন করিয়াও কোনও ফল হইল না। অচঞ্চল ক্ষুদিরাম ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলেন।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর জেলে ক্ষুদিরাম গীতা, মহাভারত ও রামকৃষ্ণের

উপদেশ পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সকলও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। মজ্জিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবন-চরিত পাঠ করিতেও তিনি আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজপুত রমণীরা যেমন নির্ভয়ে অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন—তিনিও চাহিয়া-

ক্ষুদিরাম বসু

ছিলেন সেইরূপ সাহসের সহিতই জীবন বিসর্জ্জন দিতে। চতুর্ভুজার প্রসাদ খাইয়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১ই আগষ্ট—১৯০৮। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষুদিরাম প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার শেষ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় চলিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

ঘাতক তাঁহার কণ্ঠে ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিল। রজ্জু সম্বন্ধে তিনি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ফাঁসির দড়িতে এত মোম দেওয়া হয় কেন?"

একটু পরেই সব শেষ। পদদ্বয়ের নিম্ন হইতে মঞ্চ অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদিরামের দেহ ঝুলিয়া পড়িল। পুলিশ, মিলিটারী পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এবং দর্শকরূপে উপস্থিত দুইজন সাহেব, দুইজন বাঙ্গালী ও দুইজন বিহারীর সম্মুখে মজঃফরপুর জেলে তরুণ যুবক ক্ষুদিরাম জীবন দিয়া মৃত্যুকে জয় করিলেন।

যে দুইজন বাঙ্গালী ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন অন্যতম। তিনি এখনও জীবিত আছেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার "ক্ষুদিরাম" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিখিয়াছেন—

"* * দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার বড় বা আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চার জন পুলিশ। কথাটি ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া কারাবাসকালীন বর্দ্ধিত

চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া বিন্যস্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দিকে আর একটি বার চাহিল। তারপর দৃঢ়পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবা-মূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিকে একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।"

বিপুল জনসমাগমের মধ্যে গণ্ডক নদের তীরে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। তাঁহার ফাঁসির খবর পাইয়া কলিকাতার ছাত্র ও যুবকগণ শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং নগ্নপদ হন। অনেকে সেদিন নিরামিষ আহার করেন।

এইভাবে আজ হইতে চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে বাংলা দেশ হইতে বহু দূরে বাংলার দুইটি তরুণ কিশোর পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের সেই শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী যে শোকোচ্ছ্বাস সেদিন উত্থিত হইয়াছিল—আজও তাহার বেগ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় নাই। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—দুইজনের স্মৃতিতে আজও বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া উঠে, নূতন করিয়া যেন আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে "কেশরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ

প্রকাশের অভিযোগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল।

মুরারিপুকুর বাগানে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাপ্তি এবং আলিপুর বোমার মামলা

কিংসফোর্ড-হত্যাপ্রচেষ্টার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ কিন্তু এক বিরাট্ ষড়্যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং তাহারই ফলে ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে মাণিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে হইল খানাতল্লাস। খানা-তল্লাসার ফলে বহু বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম, কার্ত্তুজ, পিস্তল প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হইল। ইহা ব্যতীত প্রফুল্ল চাকীকে (দীনেশ) মজঃফরপুরে প্রেরিত টাকার একটি মণিঅর্ডার রসিদ (৮ই এপ্রিল তারিখযুক্ত) এবং মজঃফরপুরের যে ধর্ম্মশালায় প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ছিলেন—সেই ধর্ম্মশালা ও কিংসফোর্ডের বাংলোর নক্সাও পুলিশ ঐখান হইতে প্রাপ্ত হইল।

ঐ বাগানেই যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। শ্রীঅরবিন্দকেও সেইদিন রাত্রেই তাঁহাদের গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের বাটী হইতে গ্রেপ্তার করা হইল। এইভাবে নানা স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া মোট ৩৪ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়—তাহাই আলিপুর বোমার মামলা নামে পরিচিত। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে সকলকে অভিযুক্ত করা হইল। এই মামলার শুনানী চলিয়াছিল এক বৎসর ধরিয়া এবং অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সরকার পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন।

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালের ৮ই জুন তারিখে ভারত সরকার সংবাদপত্র-আইন ও বিস্ফোরক আইন আইন-পরিষদে পাশ করাইয়া লইলেন। পরিষদের একদিনের অধিবেশনেই উপরোক্ত আইন দুইটি পাশ হইয়া গেল। বিস্ফোরক আইনে শাস্তির এই বিধান রহিল যে, কাহারও নিকট বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। সংবাদপত্র-আইনে কোনও সংবাদপত্রে হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপে উৎসাহদানমূলক রচনা প্রকাশিত হইলে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত এবং সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল; সম্পাদক ও মুদ্রাকরের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তো হইলই।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মেদিনীপুরের বিখ্যাত কর্ম্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্তদের অন্যতম। তাঁহার কথা কিছু কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। স্বর্গত রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত অভয়চরণ বসুর সপ্তম সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বদেশী ভাবধারায় মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার জননীর নাম তারাসুন্দরী বসু। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের তিনি মাতুল ছিলেন। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রবিবার তাঁহাদের মেদিনীপুরের বাটীতে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। অভয়চরণ ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শৈশবকালেই সত্যেন্দ্রনাথের মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র হিসাবে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

মধ্যে নির্ভীক তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি গুণসকল বিকাশলাভ করিতে থাকে। তাঁহার আন্তরিক অকপট ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

১৮৯৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৯৯ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিটি কলেজে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সহসা তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া পড়ায় চিকিৎসকদের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৯০২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে যোগদান করেন। যে গুপ্ত-সমিতিটি তখন সবেমাত্র মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করিলেন।

সেই সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি কুস্তীর আখড়ায় সকলকে নানাবিধ কসরৎ শিক্ষা দেওয়া হইত। সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টা ও যত্নে রাজনৈতিক আন্দোলন মেদিনীপুরে দ্রুত প্রসারলাভ করিতে লাগিল।

কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডে গুপ্ত-সমিতির যে কেন্দ্র স্থাপিত ছিল, কিছুদিন পরে সত্যেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। নানা কারণে কিন্তু কলিকাতায় তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না—তাই মেদিনীপুরেই আবার তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। সংসারের আর্থিক অবস্থা এই সময় অস্বচ্ছল হইয়া পড়ায় খড়্গপুরে কেল্‌নার কোম্পানীর হোটেলে একটি কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া তিনি খড়্গপুরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু মেদিনীপুরে রাজনৈতিক আন্দোলনও অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

কেল্‌নার কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুরের কালেক্টরিতে কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া পুনরায় মেদিনীপুরে গেলেন, তখন বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল

আন্দোলন সুরু হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আবার নূতন করিয়া মেদিনীপুরে একটি বিপ্লবীকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন—তাহার ছদ্ম নাম হইল তাঁতশালা। সেখানে তাঁতে কাপড় বুনার ভাণ করা হইত—কিন্তু আসলে সেটি ছিল বিপ্লবীদের মিলিত হইবার ও পরামর্শ করিবার একটি

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গুপ্ত আড্ডা। ক্ষুদিরামও এই তাঁতশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিদেশী বস্ত্র ও লবণ নষ্ট করিয়া দেওয়া, পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা, কার্য্যে বাধাদানকারীদের সমুচিত শাস্তি-বিধান—ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিকল্পনা এই তাঁতশালাতেই রচিত হইত। সকল পরামর্শ ও কার্য্যেই সত্যেন্দ্রনাথ

ছিলেন প্রধান। পরবর্ত্তীকালে "ছাত্রভাণ্ডার" স্থাপিত হইলে তাঁতশালার অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়।

গুপ্ত-সমিতির তত্ত্বাবধানে লাঠি-খেলা, অসি-খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সদস্যদিগকে রিভলবার চালনাও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের বন্দুকটি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আখড়ায় উপস্থিত হইতেন। যুবকদিগের উদ্দীপনা তাহাতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইত।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের দ্বারা মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর সত্যেন্দ্রনাথদের বাটীতেও খানাতল্লাস হইল এবং কিছু কিছু জিনিষ পুলিশ লইয়া গেল। সত্যেন্দ্রের সহিত ক্ষুদিরামের যোগাযোগের বিষয় পুলিশের অজানা ছিল না; ক্ষুদিরামের নিকট যে পিস্তল পাওয়া গিয়াছিল—পুলিশের ধারণায় তাহা নাকি সত্যেন্দ্রনাথেরই দেওয়া। খানাতল্লাসার পর বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ সত্যেন্দ্রনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেলসনের এজলাসে বিনা অনুমতিতে অস্ত্র-রক্ষা ও উহা লইয়া প্রকাশ্যে ভ্রমণ ইত্যাদির অভিযোগে তাঁহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। দণ্ডপ্রাপ্তির পর তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলেই রাখা হইয়াছিল। অবশেষে আলিপুর বোমার মামলার সহিতও যখন তাঁহার যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়, তখন সেই মামলাতেও তাঁহার বিচারের জন্য তাঁহাকে লইয়া আসা হয় আলিপুর জেলে।

কানাইলাল দত্ত

আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন কানাইলাল দত্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে ১৮৮৭ সালের

জন্মাষ্টমী তিথিতে মাতুলালয় চন্দননগরে কানাইলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গত চুনিলাল দত্ত বোম্বাই-এ Marine-বিভাগের হিসাবরক্ষক ছিলেন এবং তাঁহার নিকটই কানাইলালের বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার মাতার নাম ব্রজেশ্বরী দেবী। কানাইলালের পৈত্রিক বাড়ী শ্রীরামপুরে।
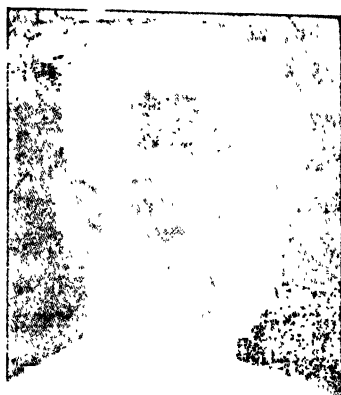
কানাইলাল দত্ত

১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত সময়ের বেশির ভাগই বোম্বাই-এ কাটাইয়া ইহার পর কানাইলাল চন্দননগরে আসেন এবং ডুপ্লে কলেজ হইতে প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডুপ্লে কলেজে অধ্যয়ন কালে অধ্যাপক চারু রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মন বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়।

হুগ্‌লী কলেজে ইহার পর তিনি ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর আলিপুর বোমার মামলার সংশ্রবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনার্স সহ তাঁহার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়—তখন তিনি জেলে।

কানাইলালের সাহসিকতার সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। কোনও একটি চট কলের মাতাল ফিরিঙ্গীদের উৎপাতে সেখানকার লোকেরা একবার অতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কানাইলাল প্রথমে তাহাদের সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় শেষে একদিন তাহাদের দুইজনকে ধরিয়া উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন। তবে তাহাদের খানিকটা শিক্ষালাভ হয়।

১৯০৭ সালে কোন একটি সার্কাস দল চন্দননগরে খেলা দেখাইয়া টাকা লুটিবার ফন্দী করে। কানাইলাল তাঁহার দলবল লইয়া গিয়া প্রথমে ভাল কথায় দলের ম্যানেজারকে সেখান হইতে সার্কাস উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ম্যানেজার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না এবং দুইপক্ষে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল। উদ্ধত ম্যানেজারকে শেষ পর্য্যন্ত প্রহারের দ্বারা শান্ত করিতে হইল।

বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর বিপ্লবীদলে যোগদান করিবার জন্য কানাইলাল যখন চাঁপাতলায় "যুগান্তর"-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন—তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহাতে তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সেই জন্য বিপ্লবীরা তাঁহাকে পুরী পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে পুরী হইতে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় এখানে-ওখানে কয়েকদিন রাখিয়া শেষে ভবানীপুর-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিপ্লবীদের সেখানে বোমা তৈয়ারী শিখান হইত।

এই ভবানীপুর-কেন্দ্রে থাকিতেন সামান্য কয়েকজন যুবক—তাঁহাদের যাহা কিছু কাজ, তাহা তাঁহাদিগকে নিজেদেরই করিয়া লইতে হইত। হেমচন্দ্র দাস মধ্যে মধ্যে ঐ বাটীতে গিয়া ইঁহাদিগকে বোমা তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষা দান করিতেন।

শীঘ্রই কিন্তু বাড়ীটির উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িল এবং বিপ্লবীরা তাহাদের নজর এড়াইবার জন্য ১৫নং গোপীমোহন দত্তের লেনে উঠিয়া গেলেন। সেখানেও কিন্তু গোয়েন্দাদের দৃষ্টি পড়িতে বিলম্ব হইল না। মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ডের পর ২রা মে তারিখে পুলিশ গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী খানাতল্লাস করিল। নানা জিনিষপত্রের সহিত অপর একজন সঙ্গী সহ কানাইলাল ঐ বাড়ীতেই ধৃত হইলেন। অন্যান্য ধৃত ব্যক্তিদের সহিত আলিপুর জেলে তাহাকে রাখা হইল। ঐ আলিপুর জেলেরই বর্ত্তমান নাম হইয়াছে প্রেসিডেন্সি জেল।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই

মামলা চলিতে থাকা কালে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে দলের একটি যুবক সহসা রাজসাক্ষী হইয়া দাঁড়াইল। সে ছিল শ্রীরামপুরের জনৈক ধনী জমিদারের একমাত্র পুত্র। প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম করিয়া হঠাৎ একদিন তাহার বিপ্লবী হইবার সখ হয় এবং কোনও মতে বিপ্লবী দলে প্রবেশলাভ করে। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথমাবধি সে গুপ্তচররূপেই বিপ্লবী-দলে প্রবেশ করিয়াছিল; সে সম্বন্ধে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রমাণ নাই।

যাহা হউক, জেলে গিয়া গোঁসাই উপলব্ধি করিল যে, বিপ্লবী সাজার ঠেলা সামান্য নয়। তাহার সখের বিপ্লববাদ অল্পদিনের মধ্যেই হাওয়ায় উবিয়া গেল এবং যে কোন উপায়ে জেল হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার বিলাসী আরামপ্রিয় জীবনে জেলের কষ্ট সহ্য হইল না। ইহার পর তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন রাজসাক্ষী হইয়া তাহার পরিত্রাণলাভের একটা উপায় নির্দ্দেশ করিলেন—তখন সে তাহাতেই রাজি হইল।

ইহার পর হইতে নরেনের সহিত মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পুলিশ-কর্ত্তাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। অপরাপর ধৃত বিপ্লবীদেরও ইহা অজানা রহিল না। তাঁহারাও শুনিলেন ও বুঝিতে পারিলেন, নরেন রাজসাক্ষী হইতে চলিয়াছে। নরেন গোঁসাই-এর বুদ্ধি কিন্তু তীক্ষ্ণ ছিল না। সে মনে করিত, অন্যান্য বিপ্লবীরা তাহার চালাকী বুঝিতে পারেন নাই। তাই ভিতরের নানা খবর জানিবার জন্য সে যখন মাঝে মাঝে হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া কথাচ্ছলে ইঁহাকে-উঁহাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তখন অন্যান্য বিপ্লবীরা মনে মনে করুণার হাসি হাসিতেন। কাল্পনিক উত্তর দিয়া কৌতুক করিতেও অনেকে ছাড়িতেন না।

নরেনের এই ঘৃণিত আচরণে বিপ্লবীরা তাহার উপর খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। তরুণ বিপ্লবীরা বিশেষ করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। নরেনের সহিত একত্র থাকা কালে সুশীল সেন প্রভৃতি তো জেলের মধ্যেই তাহাকে ইট মারিয়া বা তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন! দুই-একজনের হাতে নরেন নিগৃহীতও হইল। আদালতে যাতায়াতের সময় সুবিধামত কোনও একস্থানে নরেনকে হত্যা করিবার জন্য জেলের বাহিরে অবস্থিত বিপ্লবীদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তাহাতে অবশ্য কোনও কাজ হয় নাই।

সকলেই কিন্তু বিশেষভাবে ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, নরেনের জীবন যথেষ্ট সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিরাপত্তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ

তাহাকে অন্যান্য কয়েদীদের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া ইউরোপীয় ওয়ার্ডে সরাইয়া দিলেন এবং দুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে তাহার রক্ষী

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

করিয়া দেওয়া হইল। নরেন কোথাও যাইলে তাহাদের কেহ না কেহ তাহার সঙ্গে থাকিত।

আলিপুর জেলে আনীত হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ পীড়া প্রভৃতির জন্য

বরাবর জেলের হাসপাতালেই অবস্থান করিতেছিলেন। নরেনের রাজসাক্ষী হওয়ার সংবাদটা একদিন তাঁহার কানেও গেল; তিনি চিন্তিত হইলেন। যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা ধৃত হন নাই—তাঁহাদের কত বড় সর্ব্বনাশ যে নরেন গোঁসাই করিতে যাইতেছে, তাহা ভাবিয়াই তাঁহার এই উৎকণ্ঠা। ইহার উপায় কি? একমাত্র উপায় হইতেছে নরেন গোঁসাইকে দৃশ্যপট হইতে অপসারিত করা; নতুবা সকলের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সরাইয়াই বা দেওয়া যায় কি করিয়া?

হাসপাতাল হইতে হেমচন্দ্র দাসের সহিত সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ শুনিলেন যে, বাহির হইতে কতকগুলি পিস্তল জেলের মধ্যে আনাইয়া কয়েদীদের একযোগে জেল হইতে পলায়নের একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ পরিকল্পনা কতখানি কার্য্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইল। এদিকে বাহিরের বিপ্লবীদের হাতে গোঁসাই-হত্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেও যে তাহার মুখ বন্ধ হইবে না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। নরেনকে হত্যা করিবার জন্য অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি নিজেই একটি পরিকল্পনা রচনা করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু হেমচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, জেল হইতে কয়েদীদের পলায়নের ব্যবস্থাকল্পে সর্ব্বপ্রথম যে পিস্তলটি বাহির হইতে জেলের মধ্যে আনীত হইবে, তাহা যেন তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরেনকে হত্যা করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল—তাহা সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিলেন না।

এদিকে নরেন গোঁসাই-এর সহিতও সত্যেন্দ্রনাথ যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। নরেনকে তিনি জানাইলেন যে, জেলের কষ্ট তাঁহার আর সহ্য হইতেছে না, রাজসাক্ষী হইয়া মুক্তি পাইতে তিনিও ইচ্ছুক; নরেন

যেন সেইরূপ ব্যবস্থা করে। সত্যেন্দ্রনাথের এই অভিলাষ অবগত হইয়া নরেনের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল ; কারণ রাজসাক্ষীরূপে সত্যেন্দ্রনাথকে পাইলে তাহারও অনেক সুবিধা। সে যাহা বলিবে, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারাও সমর্থিত হইলে তাহার সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে বিশেষ বাধা থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে তাহার মুক্তিলাভ আরও সহজতর হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা নরেন গোসাই পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইল এবং তাঁহারাও ইহাতে রাজি হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিবার জন্য তখন হইতে নরেন প্রায়ই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। দেখা করিতে আসিবার সময় দুইজন ইউরোপীয় প্রহরীর যাহাকে হউক সে সঙ্গে লইয়া আসিত। সত্যেন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত নরেনের সকল কথা শুনিয়া তাহা শিখিবার চেষ্টার ছলনা করিতেন— কিন্তু মহড়া দিয়া তাহার নিকট সে সকল কথা বলিবার সময় অনেক কিছুই ইচ্ছা করিয়া গোলমাল করিয়া বলিতেন। অনেক চেষ্টাতেও যখন সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়া সকল কথা গুছাইয়া ঠিক মত বলান গেল না—তখন লিখিত জবানবন্দী দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। তদনুযায়ী প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জবানবন্দী লেখার কাজ চলিতে রহিল। এই ভাবে বেশ কিছুদিন তিনি নরেনকে নানা অছিলায় ব্যাপৃত রাখিলেন এবং তাঁহার নিকট তাহাকে প্রায়ই আসিতে বাধ্য করিলেন। নরেন পুলিশকে যে সকল সংবাদ দিত, তাহা তাহার নিকট শ্রবণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ সে খবর হেমচন্দ্রকে জানাইয়া দিতেন। বিপ্লবীরা ইহাতে অনেকটা সাবধান হইবার সুবিধা পাইতেন।

একদিন সত্যেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন যে, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যে জবানবন্দী নরেন গোঁসাই প্রদান করিবে, তাহাতে আরও বহু বিপ্লবীর

নাম ও কার্য্যকলাপ সে প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা বুঝিতে সত্যেন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না। আরও অনেকের ধরা পড়ার পথ নরেন প্রশস্ত করিতেছে। মনে মনে সত্যেন্দ্রনাথ তখন কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—ঐ তারিখের পূর্ব্বেই নরেনকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

পলায়নের পরিকল্পনা মাফিক একটি পিস্তল ইতিমধ্যে জেলের মধ্যে আসিয়া পৌছিল এবং তাহা রাখিবার ভার পড়িল হেমচন্দ্র দাসের উপর। হাসপাতালে যাওয়া হেমবাবুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু তথাপি তিনি নিজে যাইয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আর কখনও হাসপাতালে না যাইতে বিশেষ করিযা সতর্ক করিয়া দিলেন। পিস্তলটি ছিল খুবই পুরাণো আর বড়—তাহা ব্যবহার করা খুব সহজ ছিল না। তাই আর একটি পিস্তল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ উহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আর একটি পিস্তলও জেলের মধ্যে আসিল, কিন্তু হাসপাতালে যাওয়া হেমচন্দ্রের পক্ষে আর সহজ ছিল না। পিস্তলটি ভাল করিয়া কাপড়ে জড়াইয়া তিনি উহা কানাইলালকে প্রদান করিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে সেইটি দিয়া আসিবার জন্য। ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্নকালে কানাইলাল পেটব্যথার ভাণ করিয়া হাসপাতালে গিয়া সত্যেন্দ্রকে উহা প্রদান করিলেন।

কানাইলাল নরেন-হত্যার উদ্যোগ-আয়োজনের জানিতেন না কিছুই; কিন্তু পূর্ব্বেকার বড় পিস্তলটি যখন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ কানাইলালকে দিলেন উহা হেমচন্দ্রকে দিবার জন্য—তখন কানাইলাল বুঝিতে পারিলেন হস্তস্থিত বস্তুটি কি। সাংঘাতিক একটা কিছু যে

ভিতরে ভিতরে বেশ পাকাইয়া উঠিতেছে, তাহা কানাইলাল আন্দাজেই খানিকটা উপলব্ধি করিলেন। ব্যাপারটি জানিবার জন্য তাঁহার খুবই আগ্রহ হইল এবং সকল ব্যাপার তাঁহাকে বলিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সকল বিষয় তাঁহাকে বলা হইলে কানাইলাল প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তারপর উক্ত কার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথকে সহায়তা করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কানাইলালের আগ্রহাতিশয্যে সত্যেন্দ্রনাথকে উহাতে রাজি হইতে হইল। স্থির হইল যে, পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সকালবেলা হাসপাতালের ডিস্‌পেনসারির মধ্যে পরামর্শ করিবার ছলে নরেনকে ডাকাইয়া আনিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে হত্যা করিবেন। কানাইলাল অপেক্ষা করিবেন ডিস্‌পেনসারির বারান্দায়। কোনও কারণে সত্যেন্দ্রনাথ বিফল হইলে তবেই কানাইলালও নরেন্দ্রকে আক্রমণ করিবেন।

পরিকল্পনামত ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালের দিকেই সত্যেন্দ্রনাথ নরেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুইজন ইউরোপীয় প্রহরীর মধ্যে হিগিনস্ নামক একজনকে সঙ্গে লইয়া নরেনও আসিল দেখা করিতে। হাসপাতালের দুই তলায় ডিস্‌পেনসারির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ একখানি বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। নরেন আসিয়া তাঁহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল। হিগিনস্ অন্যত্র সরিয়া গেল।

কথাবার্ত্তার মাঝখানে তাঁহার জামার পকেটে হাত রাখিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ একসময় পিস্তলের ট্রিগার টিপিলেন। পিস্তলের গুলি সগর্জ্জনে ছুটিয়া গিয়া নরেনের উরুদেশে বিদ্ধ হইল। চীৎকার করিতে করিতে নরেন উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। হিগিনস্ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সত্যেন্দ্রের পিস্তল কাড়িয়া লইতে গেল, কিন্তু পারিল না; কারণ দড়ি দিয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথ নিজ কোমরের সহিত বাঁধিয়া

রাখিয়াছিলেন। হিগিনস্ ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পিস্তলের গুলি ছুটিয়া লাগিল হিগিনসের হাতে। নরেন যেদিকে গিয়াছিল—চীৎকার করিতে করিতে সেও তখন সেইদিকেই ছুটিল।

কি একটু কাজে কানাইলাল ক্ষণেকের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন। পিস্তলের আওয়াজ পাইয়া তিনি বারান্দায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—পাখী পলাইয়াছে। দেখিয়াই তিনি পিস্তল লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া তৎক্ষণাৎ নীচে ছুটিলেন—আর তাঁহারই পশ্চাতে পিস্তল লইয়া ধাবিত হইলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

হাসপাতালের গেটের দিকে ছুটিয়া গিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা দুইজন গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল—সেই গেল ভয়ে পলাইয়া। কানাইলালের পশ্চাৎ হইতে নরেনের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের একটি গুলিতে একবার কানাইলালেরই গায়ের চামড়া ছড়িয়া গেল।

জেলের ডাক্তার, জেলের অধ্যক্ষ ইত্যাদি অনেকে নরেনকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। পুনরায় গুলি খাইয়া নরেন একস্থানে স্নানাগারের নিকটস্থ এক নর্দ্দমায় মুখ নীচু করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কানাইলাল আরও একবার নরেনকে গুলি করিলেন। দুইজনের দ্বারা মোট নিক্ষিপ্ত নয়টি গুলির মধ্যে চারিটি গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল নরেনের শরীরে।

ইহার পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নরেনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাহার মৃত্যু হইল। নরেনের মুখ চিরতরে বন্ধ হইল।

গোঁসাই-হত্যার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা হইল—আলিপুরের সেসনস্ জজ মিঃ রো-র নিকট। কানাইলাল

বিচারের সময় একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথই একমাত্র নরেনের হত্যার জন্য দায়ী ; কিন্তু বিচারের সময় সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা যখন প্রতীয়মান হইল যে, সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না—তিনি হয় তো মুক্তি পাইলেও পাইতে পারেন, তখন কানাইলাল তাঁহার পূর্ব্ব উক্তি প্রত্যাহার করিয়া নরেন-হত্যার সকল দায়িত্ব এককভাবে নিজের উপরই গ্রহণ করিলেন।

দোষী সাব্যস্ত হইয়া বিচারে কানাইলাল মৃত্যুদণ্ড পাইলেন—কিন্তু অধিকাংশ জুরি সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দ্দোষ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বিচারক সত্যেন্দ্রনাথের মামলা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন।

২১শে অক্টোবর হাইকোর্টে সত্যেন্দ্রনাথের মামলার শুনানী হয় এবং বিচারে তাঁহার প্রতিও মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। কানাইলালের মৃত্যু-দণ্ডও হাইকোর্টে অনুমোদিত হইল।

ফাঁসির পূর্ব্বে কানাইলাল দত্তের শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বধ্যমঞ্চে লইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিজের ঘরে প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির পূর্ব্বদিন জনৈক ইউরোপীয় প্রহরী তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল যে, সেদিনও কানাইলাল হাস্য-পরিহাস করিতেছেন বটে, কিন্তু পরদিন তাঁহার হাসি কোথায় মিলাইয়া যাইবে। ফাঁসির মঞ্চ হইতে কানাইলাল সহাস্যে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আজ আমায় কেমন দেখাচ্ছে ?"

জল্লাদকে বলিলেন,—"গলায় লাগ্‌ছে—দড়িটা বড্ড শক্ত।"

ফাঁসির পর কাল কম্বলে ঢাকা মৃতদেহ জেলখানা হইতে মহাসমারোহে কালীঘাট শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হয়। সে বিপুল সমারোহ ও উত্তেজনা দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন।

দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণের নামের তালিকা হইতে কানাইলালের নাম কাটিয়া দেওয়া হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হইয়াছিল ২১শে নভেম্বর শনিবার। কানাইলালের শবদাহের সময় সমারোহ দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়াছিলেন বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের শবদেহ আর জেলখানার বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। জেলখানার মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল। তাঁহার কোনওরূপ স্মৃতিচিহ্নও গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই।

নন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত

কানাইলালের ফাঁসির পূর্ব্বদিন—অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর তারিখে আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। ঐ দিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সার্পেণ্টাইন লেন ও কেরাণীবাগানের মোড়ে পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার মূলে - আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাইলেন।

ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য কলিকতার ওভারটুন হলে ৭ই নভেম্বর আর একবার চেষ্টা করা হইল—কিন্তু পূর্ব্ববৎ সে চেষ্টাও সফল হইল না। পুলিসের গোয়েন্দা বলিয়া অনুমিত এক ব্যক্তি এই মাসেই নিহত হইল ঢাকায় এবং নদীয়া জেলার রায়টাতে একটি ডাকাতিও হইল।

আলিপুর বোমার মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় গুপ্ত-সমিতির সহিত শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণিত হইল না—সুতরাং তিনি মুক্তি পাইলেন। এই মামলার বিচারক বীচক্রফট্ সাহেব ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। উভয়েই একসঙ্গে আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

অভিযুক্ত আর সকলেরই শাস্তি হইল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হুকুম শুনিয়া অকুতোভয় উল্লাসকর সহাস্যে বীচক্রফট্‌কে বলিয়া উঠিলেন,—"থ্যাঙ্ক ইউ, সার।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দশজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল—অবশিষ্ট আর সকলের হইল পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। হাইকোর্টে আপিল করার ফলে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ্ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয় এবং অন্যান্য আরও কয়েকজনের দণ্ডাদেশ কিছু কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষের অন্যতম উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। কলিকাতার সুবার্ব্বন পুলিশ আদালত হইতে বাহিরে আসার সময় ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি গুলির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। হত্যাকারীর পরে ফাঁসি হইয়াছিল। ঐ সালেরই জুন মাসে ফতেজঙ্গপুরে জনৈক গোয়েন্দার ভ্রাতাও নিহত হইল।

স্বদেশী ডাকাতি

বিপ্লবী-সংগঠন উত্তমরূপে পরিচালিত করার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। অর্থ-সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে প্রমথ মিত্রের সভাপতিত্বে এক গুপ্ত সভায় ডাকাতির প্রশ্নটি আলোচিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে স্বদেশী ডাকাতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্টের টাকা লুঠ করিতে হইলে যে প্রস্তুতি ও শক্তির প্রয়োজন—বিপ্লবীদের তাহা ছিল না; সুতরাং দেশের লোকের মধ্যেই যাহারা দেশদ্রোহী, গুপ্তচর, মদ্যপ, অত্যাচারী, অসৎপ্রকৃতি, অতিরিক্ত সুদখোর বা

অপব্যয়কারী—তাহাদের উপরই ডাকাতি করা হইবে বলিয়া স্থির হইল। আরও ঠিক হইল যে, লুন্ঠিত টাকার একটি হিসাব রক্ষা করা হইবে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর উক্ত টাকা পুরাপুরি পরিশোধ করা হইবে।

পুলিনবিহারী দাসের দ্বারা পরিচালিত ঢাকার অনুশীলন-সমিতির নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সময় তৎকালে এই অনুশীলন-সমিতি জনসাধারণকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছিল এই সমিতির বহু শাখা-প্রশাখা।

স্বদেশী ডাকাতিতেও অনুশীলন-সমিতি দক্ষতার পরিচয় দিল। প্রথম ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইল নারায়ণগঞ্জে। প্রায় হাজারখানেক টাকা লুন্ঠিত হইলেও বিপ্লবীরা কিন্তু সমুদয় অর্থ লাভ করিতে পারিলেন না। অন্ধকারে পলায়নের সময় টাকার থলিটি ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সকল টাকা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে পুনরায় সকল অর্থ কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। ইহার পর শেখরনগর নামে একখানি গ্রামেও ডাকাতির চেষ্টা হয়। তখন বর্ষাকাল। নৌকাযোগে এক গৃহস্থের বাটীতে হানা দিয়া বহুকষ্টে একটি সিন্ধুক নৌকায় আনিয়া তুলিলে নৌকাটি সিন্ধুকের ভারে ডুবিয়া গিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করিল। সে বারেও সামান্য কিছু টাকা লইয়াই বিপ্লবীদের ফিরিয়া আসিতে হয়। আরও দুই একটি ছোট-খাট ডাকাতি এখানে-ওখানে সংঘটিত হইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুইটি ডাকাতি হইল বড়ঢ়া এবং নড়িয়ায়। ঢাকা জেলার বড়ঢ়া গ্রামে ডাকাতি হয় ১৯০৮ সালের ২রা জুন। অনুশীলন-সমিতির প্রায় ছত্রিশ জন যুবক এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। মধ্য রাত্রিতে দুইটি নৌকায় চড়িয়া বড়ঢ়া গ্রামে সকলে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপ্লবীরা

গুলি ছুঁড়িলে তাহারা ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। নির্দ্দিষ্ট গৃহের সিন্ধুক হইতে টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া নৌকায় তুলিবার সময় দলের নেতা শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক ব্যক্তির দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইলেন। আত্মরক্ষার্থ তিনি গুলি নিক্ষেপ করায় আক্রমণকারী লোকটি নিহত হইল। গ্রামের লোকেরা নৌকা দুইটির অনুসরণে বিরত হইল না। প্রাতঃকালেও তাহারা নৌকা দুইখানিকে আক্রমণ করিল এবং নৌকার উপর হইতে বিপ্লবীরা গুলি চালাইলে তাহাতেও কয়েকজন হতাহত হইল। কিছু পরে বন্দুক ও লোকজন সহ নৌকা লইয়া সাভার থানার দারোগা আসিলেন যুবকগণকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া। দারোগার গুলিতে দলের একজন প্রাণও হারাইলেন। অবশেষে দারোগার দলেরও যখন একজন হত ও একজন আহত হইল, তখন অনুসরণ ত্যাগ করিতে দারোগাটি বাধ্য হইলেন।

ইহার পর একটি ষ্টীমলঞ্চ লইয়া পুলিশ পুনরায় নৌকা দুইখানির অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। বিপ্লবীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূর হইতেই তাহা দেখিতে পাইলেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তাঁহারা নৌকা দুইখানি পার্শ্ববর্ত্তী একটি খালের মধ্যে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। লঞ্চখানি উপস্থিত হইয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বিপ্লবীদের পাত্তা পাইল না। পুলিশের দল প্রস্থান করিলে নৌকা দুইখানি পুনরায় অগ্রসর হইল। দাঁড় টানিয়া সকলেই খুবই ক্লান্ত হইয়াছিলেন—কাজেই গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। যাঁহারা গুণ টানিতেছিলেন তাঁহাদিগকে সহসা কোন এক স্থানের একদল গ্রামবাসী আক্রমণ করিয়া বসে এবং একজন যুবককে ধরিয়া লইয়া যায়। নৌকার যুবকগণ গিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। এইভাবে পথে সকলে আরও দুইবার গ্রামবাসীদের

দ্বারা আক্রান্ত হন এবং বহুকষ্টে শেষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পান। যাহা হউক, এই ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবীরা প্রায় হাজার ছাব্বিশেক টাকা সংগ্রহ করেন।

ঐ সালেরই ৩০শে অক্টোবর তারিখে ডাকাতি হইল নড়িয়ায়। নড়িয়া ফরিদপুর জেলার একখানি গ্রাম। বিপ্লবীরা আশা করিয়াছিলেন যে, নড়িয়া বাজারে ডাকাতির দ্বারা অন্ততঃ লাখখানেক টাকা পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বেই টাকা লইয়া সরিয়া পড়ায় আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই।

ইহার পরই ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একদিনেই ১৪নং সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাশ হইল। এই আইনে হত্যা ও ষড়্‌যন্ত্রের অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের সরাসরি বিচারের সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি অপরাধের জন্য জুরি বা এসেসর ব্যতীতই হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চে আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা হইল। এই আইনের দ্বারাই বড়লাট সন্দেহবশে যে কোন সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করারও অধিকার পাইলেন।

১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যেই বড় বড় নেতারা হইলেন ধৃত ও কারারুদ্ধ। এই সকল ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার অনুশীলন-সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্-সমিতি ও সাধনা-সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী-সমিতি এবং কলিকাতার অনুশীলন-সমিতি ও আরও অন্যান্য সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইল।

১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে আহ্‌মেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর

গাড়ীর নিকট বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই বৎসরেই যশোহরের নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র মামলায় ছয় জনের সাত বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর, তিন জনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। নদীয়া জেলার হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলায় হইল পাঁচ জনের আট বৎসর, একজনের সাত বৎসর এবং একজনের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারের তরফে সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক কাজ করিয়াছিলেন মৌলভী শামস্থল আলম—পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গুরুতর তদন্তকার্য্যে লিপ্ত। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক একটি আঠার বৎসরের যুবকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারপথে ১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। বিচারে বীরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয় এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁহার ফাঁসি হইয়া যায়।

ষড়যন্ত্র মামলার আধিক্য

পুলিশের ভূয়া ধাপ্পায় প্রতারিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে শামস্থল আলমকে হত্যা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কর্তৃক তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চাশজনকে বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, ডাকাতি, হত্যায় সহযোগিতা ইত্যাদি নানা অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত হইল। হাইকোর্টের সেসনে প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সের বিচারে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই মুক্তিলাভ করেন।

ঢাকা অনুশীলন-সমিতির পুলিনবিহারী দাসের ধৃত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রেপ্তার করার পর তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইয়াছিল। অবশেষে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাকে পুনরায় অস্ত্র-আইনে ধৃত করা হইল। শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র-আইন মোকদ্দমা হইতে তিনি রেহাই পাইলেন বটে, কিন্তু আর একটি বৃহত্তর মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলেন। এই মামলা ঢাকা ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত। ১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে এই মামলা আনীত হইয়াছিল। পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি ৪৫ জনের বিরুদ্ধে এই মামলায় যে প্রধান অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল—তাহা ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের। পি, মিত্র এই মামলার দায়িত্বভার গ্রহণে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পীড়িত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, সুতরাং মামলা পরিচালিত করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ঢাকা ষড়্‌যন্ত্র মামলায় ১৫ জনের সাত হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পুলিনবিহারী দাসের হইয়াছিল সাত বৎসর কারাদণ্ড। তাঁহাকে পাঠান হইল আন্দামানে।

১৯১০ সালে খুলনা ষড়্‌যন্ত্র মামলা এবং ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়্‌যন্ত্র মামলা হইয়াছিল। শেষোক্ত মামলায় ঢাকা সমিতির ২৬ জন অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অন্তরীণ করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী গ্রেপ্তারের পরোয়ানাও বাহির হইয়াছে। এই অবস্থায় ভগিনী নিবেদিতারই পরামর্শক্রমে শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পলাইয়া চন্দননগরে গেলেন এবং বিপ্লবী মতিলাল

রায়ের বাটীতে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর একখানি ফরাসী জাহাজে চাপিয়া পণ্ডিচারীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তদবধি তিনি পণ্ডিচারীতেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন আছেন।

কতকগুলি হত্যাকাণ্ড ১৯১১ সালেও অনুষ্ঠিত হইল। ফেব্রুয়ারি মাসে একজন হেড কন্‌ষ্টেবল শ্রীশ চক্রবর্ত্তী, এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে বোমার মামলার সাক্ষী মনোমোহন দে, জুন মাসে টিনেভেলীর কালেক্টর অ্যাস সাহেব এবং ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর রাজকুমার রায় বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

এই বৎসরেরই প্রথম দিকে ঢাকা জেলার সোনারং-এ ডাক পিওনের উপর আক্রমণ করার অভিযোগে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষক ও ছাত্রকে এক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। পাঠশিক্ষা ব্যতীতও এই বিদ্যালয়টিতে লাঠিখেলা, নানাবিধ ব্যায়াম ইত্যাদিরও চর্চ্চা করা হইত এবং ছুতার ও কামারের কাজও ছাত্রদিগকে শিখান হইত। পূর্ব্ব হইতেই এই বিদ্যালয়টিকে পুলিশ সুনজরে দেখিত না। যাহা হউক, যে মামলাটি রুজু হইয়াছিল, তাহাতে সাতজন দণ্ডিত হইলেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের তিনজন সাক্ষী ১১ই জুলাই তারিখে উক্ত গ্রামেই নিহত হইল।

মনোমোহন ঘোষ নামক পুলিশের একজন ইন্‌সপেক্টরকে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বরিশালে হত্যা করা হয়। ১৯১১ সাল হইতেই গুপ্ত বিপ্লব-আন্দোলন পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবান্দোলনের প্রসার

মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের মত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেও বিপ্লবী মনোভাব বিস্তারলাভ করিতেছিল। ১৯০৭ সালের কিছু পূর্ব্ব বা পর হইতেই ঐ

দুইটি প্রদেশেও আন্দোলনের প্রসার ঘটিতেছিল। স্বামী দয়ানন্দের আর্য্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পাঞ্জাবের তরুণ সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্ত্তীকালে পাঞ্জাবের লায়ালপুর, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি স্থানসমূহে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রচারকার্য্য ও তাঁহাদিগকে অপমান করা প্রভৃতি চলিতে থাকে। রাজদ্রোহকর বিষয় প্রকাশের অপরাধে "ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর এবং "পাঞ্জাবী" পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন। ভূমি-সংক্রান্ত আইন ও জমির খাজনাবৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে শিখগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন এবং পুলিশ ও সৈন্যবিভাগ হইতে শিখদিগের চাকুরী ত্যাগের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেই লাগিল। রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য লালা লাজপৎ রায়কে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয় ১৯০৭ সালের ৯ই মে। সর্দ্দার অজিত সিংহও ঐ একই আইনে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইলেন। দেশান্তরিত হওয়ার মাস ছয়েক পরে সর্দ্দার অজিত সিংহ পলাইয়া প্রথমে পারস্যে যান, তথা হইতে পরে তিনি ইউরোপ গমন করেন। বোমা তৈয়ারীর প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তক ইত্যাদি রাখার অপরাধে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত করা হইল ভাই পরমানন্দকে। শান্তিভঙ্গ না করিয়া সদ্‌ভাবে জীবন-যাপনের সর্ত্তে মুচলেকাবদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় জড়িত হইয়া পরবর্ত্তীকালে ভাই পরমানন্দ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের বড়লাট তাঁহার মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। আরও পরে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

যুক্তপ্রদেশে ১৯০৭ সালে শান্তিনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা "স্বরাজ্য" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্রোহে উৎসাহদানমূলক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকাটিতে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। ইহার ফলে শান্তিনারায়ণ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর আরও নূতন নূতন সম্পাদক আসিয়া ঐ একই ভাবে কারাদণ্ড বরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি "স্বরাজ্য"-পত্রিকায় বিদ্রোহ-প্রচার বন্ধ হইল না। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "কর্ম্মযোগিন্"-সংবাদপত্রটিও রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের ত্রুটি করিত না। ১৯১০ সালে নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইনের কবলে পড়িয়া দুইখানি সংবাদপত্রের প্রচারই বন্ধ হইয়া যায়।

বঙ্গদেশ হইতে বহু বিপ্লবী কাশী গিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহাদের দ্বারা ১৯০৮ সালে "অনুশীলন-সমিতি ও তরুণ-সঙ্ঘ" স্থাপিত হয়। কাশী বাঙ্গালী-টোলার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী-সমিতির প্রধান নেতা।

ক্ষুব্ধ ভারতীয় জনমতকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার জন্য এদিকে ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে নূতন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ-আইন বিলাতের পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল। কতকগুলি বিষয়ে এই আইনটি পূর্ব্ববর্ত্তী আইন-গুলি অপেক্ষা সামান্য প্রগতিশীল হইলেও জনসাধারণের দাবী মিটাইবার পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তাহার উপর ইহাতে আবার পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদের জাতীয় সংহতিতে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা করা হইল।

বঙ্গ-বিভাগ-ব্যবস্থা রদ্

বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। উক্ত বিভাগ রদ্ করিয়া জনমতের দাবী স্বীকার করিয়া

লইতেও তাঁহাদের বাধিতেছিল—অথচ উহা উপলক্ষ করিয়া যে প্রকাশ্য ও গুপ্ত আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল, তাহা দমন করিবার মত পর্য্যাপ্ত ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই অবস্থায় রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং দিল্লীতে একটি দরবার হইল। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই দরবারের অনুষ্ঠান হয় এবং তাহাতে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের একটি রাজকীয় ঘোষণায় কৌশলে বঙ্গ-বিভাগ বাতিল করিবার ব্যবস্থা হয়। উহাতে ঘোষিত হইল যে, কয়েকটি প্রদেশের সীমা নূতন করিয়া পুনরায় নির্ণয় করা হইবে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্তও ঐ সময়ই ঘোষণা করা হইল।

যাহা হউক, এইভাবে দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যাপারে লর্ড মর্লির পূর্ব্বঘোষিত settled fact যখন unsettled হইয়া গেল, তখন ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ্ তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক্ করিয়া একটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হইল; পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রিত হইয়া গঠিত হইলএকটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ; আসামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার শাসনভার একজন চীফ কমিশনারের উপর অর্পণ করা হইল। ভারতের রাজধানীও ঘোষণামত স্থানান্তরিত হইয়া গেল দিল্লীতে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ

নূতন রাজধানীতে প্রবেশের দিন স্থির হইল ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। ঐদিন মহাসমারোহে শোভা-যাত্রা করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ্ চলিলেন নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতে, কিন্তু অকস্মাৎ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হইল স্বয়ং বড়লাটের উপর। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ সেই বোমার আঘাতে সামান্য

আহত হইয়া বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন আর্দ্দালী নিহত হইল। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরও বলা হইবে।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসেই ঢাকায় পুলিশের হেড্ কন্‌ষ্টেবল রতিলাল রায়কেও বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিতে হইল।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

ভারতের বিপ্লবান্দোলনে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আবিভাব এই সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ (১৮৮৪ ?) খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁহার পিতা বিনোদবিহারী বসু মহাশয় পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ফরাসী চন্দন-নগরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। বাল্যকালেই রাসবিহারী মাতৃহারা হইয়াছিলেন।

বিনোদবিহারী ছিলেন ভারত সরকারের ছাপাখানার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ও সিমলায় বাস করিতে হইত। রাসবিহারীও মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত সিমলায় গিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীর সহিত মেলামেশার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় কথা-বার্ত্তা বলার দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজে পাঠের সময় রাসবিহারী ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্ত্তীকালে কলিকাতায় মর্টন স্কুলে পড়িয়া ইংরাজি ভাষাও ভাল করিয়া শিখিয়া লন ; কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিতেন না। ইহা অপেক্ষা নানাবিধ ক্রীড়ায় বরং তিনি অধিকতর আনন্দ বোধ করিতেন মর্টন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্ত্তমানের নবম শ্রেণী) গিয়াই তাঁহা

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়েই কিন্তু ইংরাজি ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধাদি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

রাসবিহারীর ক্রীড়াদক্ষতার জন্য অনেকেই তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। স্কুলে ছিলেন রাসবিহারী ছাত্রগণের নেতা। সকলের উপর নেতৃত্ব করিবার তাঁহার বিধিদত্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সুন্দর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিত না। নির্ভীক রাসবিহারী সর্ব্বসময়েই সকল অন্যায়ের বিরোধী ছিলেন। কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি বিচলিত হইতেন।

১৯০৮ সালের ২রা মে যখন মুরারিপুকুর বাগানে খানাতল্লাসী হয়, তখন রাসবিহারী বসুরও দুইখানি পত্র পুলিশ তথা হইতে প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে রাসবিহারীর বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিবার আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। শশিভূষণ রায়চৌধুরী তৎকালে দেরাদূনে শিক্ষকতা করিতেন। নিজের চাকুরীটি তিনি রাসবিহারীকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে দেরাদূনে পাঠাইয়া দিলেন। রাসবিহারী সেখানে ১৯১০ সালে দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনস্‌টিটিউটে একটি কেরাণীর পদও লাভ করেন এবং পরে ঐখানেই হেড-ক্লার্করূপে তাঁহার পদোন্নতি হয়—তখন তাঁহার বেতন হয় মাসিক একশত টাকা।

শিক্ষকতা ও চাকুরীর দ্বারা রাসবিহারী যাহা কিছু উপায় করিতেন, নিজের প্রয়োজন মিটাইতে তাহা হইতে ব্যয় করিতেন সামান্যই। উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত দরিদ্রদের জন্য। সেখানকার অধিবাসীরা এই কারণে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

রাসবিহারী ছিলেন একান্তভাবে একজন স্বাধীনতার উপাসক এবং তাঁহার ও তাঁহার জাতির স্বাধীনতাকে যাহারা খর্ব্ব করিয়াছে, তাহাদের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁহার

জীবনের চরম লক্ষ্য। শঠের সহিত ছলনা করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। স্বাধীনতাহরণকারী অত্যাচারীদিগের জন্য কোনও ক্ষমা তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। তাই তিনি প্রচার করিতেন,—"The life of a man is for working Independence and the general massacre of all foreigners in India is our primary object."

রাসবিহারী বসু

আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা শান্তিপূর্ণ মনে হইলেও ভারতের অবস্থা যে মোটেই শান্তিপূর্ণ নহে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা

করিয়া জগৎসমক্ষে তাহা ঘোষণা করাই যেন রাসবিহারীর ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। সমগ্র উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পৃথক্ বিপ্লবীদলগুলির শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত করিলেন। আমিরচাঁদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। আমিরচাঁদই তাঁহাকে অবেদবিহারী, বালমুকুন্দ, দীননাথ, রঘুবর শর্ম্মা ইত্যাদির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। হরদয়ালের সহিতও পরে রাসবিহারীর সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়া রাসবিহারী প্রথম আঘাত হানিবার চেষ্টা করিলেন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর। বসন্ত বিশ্বাস নামক একটি বালককে বালিকার বেশে সজ্জিত করিয়া পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক-ভবনের উপর হইতে তাহার দ্বারাই রাসবিহারী বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। ঘটনার পরই বসন্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি দেরাদূনে ফিরিয়া যান—যাহাতে কাহারও সন্দেহ না হয় অথবা তাঁহারা ধরা না পড়েন। নিজেই উদ্যোগ করিয়া সেখানে এক সভা তিনি আহ্বান করাইলেন এবং তাহাতে বড়লাটের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বোমা নিক্ষেপের নিন্দা করিয়া এমন তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, বক্তৃতার সময় তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নেত্র ইহা প্রমাণ করিল যে, তিনি সকল সন্দেহের অতীত।

শ্রীহট্টের মৌলভী বাজারে মহকুমা হাকিম থাকার সময় ১৯১২ সালের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন গর্ডন "জগৎসী-আশ্রম"-এর অধিবাসীদের উপর গুলি চালাইয়া ডাঃ মহেন্দ্রনাথ দে-কে হত্যা করায় বিপ্লবীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন—কিন্তু সে চেষ্টা তখন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পরই গর্ডন সাহেবকে পাঞ্জাবে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। এইবার রাসবিহারী সেই গর্ডন সাহেবের জীবন-নাশের

সঙ্কল্প করিলেন। ঐ সালেরই ১৩ই (১৭ই ?) মে তারিখে গর্ডন সাহেবের লাহোরের "লরেন্স পার্ক"-এ যাইবার কথা ছিল। রাসবিহারী তাহা জানিতে পারিয়া বসন্ত গুপ্তকে দিয়া উক্ত পার্ক-এ যাইবার পথে সন্ধ্যার সময় একটি বোমা স্থাপিত করাইয়াছিলেন। বোমাটি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গর্ডন সাহেব স্থানত্যাগ করিবার পর বিস্ফোরিত হয় এবং তাহার ফলে নিহত হয় অপর এক ব্যক্তি। লাহোরে এই বিস্ফোরণের পর পুলিশ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল, রাসবিহারী তখন পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে কিছুদিন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া অবশেষে কাশী চলিয়া গেলেন। একটি গুলিভরা মশার পিস্তল প্রায় সকল সময়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

দিল্লী ষড়্যন্ত্র মামলা

কাহাদের পরিচালনায় এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ চলিতেছে, পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন যাবৎ তাহা জানিতে পারে নাই। অবশেষে ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর রাজাবাজারে অমৃত হাজরার বাসায় খানাতল্লাসীর সময় একখানি সাঙ্কেতিক কাগজ পুলিশ প্রাপ্ত হয়। পরে যখন উক্ত লিপির অর্থ উদ্ধার করা হয়, তখন তাহা হইতে দিল্লীর আমির-চাঁদ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। আমিরচাঁদের বাটী তল্লাস করিয়া পাওয়া যায় দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতির নাম। লাহোরে দীননাথ ধৃত হয়। ধৃত হওয়ার দুই-একদিন পরেই ১৯১৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দীননাথ পুলিশের নিকট সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়। এই সকল ঘটনার পশ্চাতে রাসবিহারীর অস্তিত্বের বিষয় পুলিশ সর্ব্বপ্রথম দীননাথের নিকটই জানিতে পারিল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা কিন্তু রাসবিহারীকে ধরিতে পারিল না।

দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৯১৪ সালের ২৩শে মে তারিখে দিল্লী ষড়্যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল। ষড়্যন্ত্রের সময় দেওয়া হইল ১৯১০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯১৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত। বিচারের সময় দীননাথ ও সুলতানচাঁদ স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। বিচারে সকলেরই দণ্ড হইল। আমিরচাঁদ, অবেদবিহারী ও বালমুকুন্দ প্রাপ্ত হইলেন মৃত্যুদণ্ড। বালমুকুন্দ ছিলেন ভাই পরমানন্দের খুল্লতাতের পুত্র।

বালরাজ ও বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়, কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করা হইলে বসন্ত বিশ্বাসও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রাসবিহারীর প্রতিও মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল—কিন্তু পুলিশ তাঁহার কোনও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন গিয়া কাশীতে। শচীন্দ্র সান্যালের বিপ্লবী-সমিতির সহিত সেখানে তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হইল। উক্ত সমিতির সদস্যগণকে রাসবিহারী বোমা ও রিভলবার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে একদিন তাঁহাকে নিজেকেই আহত হইতে হইল। যাহা হউক, বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামক পুণার একজন মারাঠি যুবক এবং সত্যেন্দ্র সেন নামে একটি বাঙ্গালী যুবক এই সময় ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে একদিন আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। পিংলে পরে কাশীতে চলিয়া গেলেন এবং সত্যেন্দ্র রহিয়া গেলেন কলিকাতাতেই। কাশীতে পিংলের সহিত শচীন্দ্র সান্যাল ও রাসবিহারীর পরিচয় হইল। পিংলের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গদর দলের বহু শিখ বিপ্লব বাধাইবার জন্য আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও আসিবে। রাসবিহারী তাহাদিগকে বোমা

তৈয়ারীর কৌশল শিখাইয়া দিবার আশ্বাস দিলেন। গদর দলের শিখদিগের আগমনের বিষয় পাঞ্জাবের অধিবাসীদের জানাইবার জন্য এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করিবার জন্য রাসবিহারী পিংলেকে পাঠাইয়া দিলেন পাঞ্জাবে।

গদর দল

এখানে গদর দলের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। "গদর" অর্থে বিদ্রোহ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হরদয়াল নামক একজন ছাত্র সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯০৫ সালে অক্সফোর্ডে পড়িতে গিয়াছিলেন। লালা লাজপৎ রায় তাঁহাকে বিপ্লববাদী করিয়া তুলেন এবং সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া দুই বৎসর পরেই তিনি বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে ভারতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি ঐ সালেই ইউরোপে যান এবং ১৯১০ সালে আবার ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে লাহোরে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া বৃটিশ-শাসন অবসানের বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১১ সালে হরদয়াল কালিফোর্ণিয়ায় চলিয়া গিয়া সেখানে বৃটিশ-শাসনের বিরোধী নানারূপ প্রচার-কার্য্যে লিপ্ত হইলেন।

স্বদেশে উপযুক্ত জীবিকার অভাবে বহু শিখ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিকান্বেষণে বহির্গত হইয়া পৃথিবীর নানা-স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা, সাংহাই, হংকং, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি স্থানে অধিক সংখ্যায় তাঁহারা বসবাস করিতেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিণ শ্রমিকদিগের সহিত ইঁহাদের স্বার্থ-সংঘাত আরম্ভ হওয়ায় ইঁহাদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। বৃটিশ-রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য-দূতের নিকট এ বিষয়ে আবেদন-নিবেদন করিয়া কোনও ফল লাভ হইল না। . . . .

কানাডায় প্রবাসী শিখদিগের সংখ্যাধিক্যে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হইয়া নানারূপ ভারতীয়-বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ১৯১০ সালে রচিত একটি আইনে ইহা বিধিবদ্ধ হইল যে, দুইশত ডলার সঙ্গে না লইয়া কোনও এশিয়াবাসী কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কানাডায় গমন কালে কোথাও যাত্রা-ভঙ্গ না করিয়া স্বদেশ হইতে তাহাকে সরাসরি কানাডায় যাইতে হইবে। যেহেতু তখন কোনও জাহাজই ভারত হইতে সরাসরি কানাডায় যাইত না, সেহেতু কৌশলে ইহার দ্বারা ভারতীয়দের কানাডায় প্রবেশ অসম্ভব হইল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দের মন যখন এইভাবে নানা কারণে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন হরদয়াল সেখানে গিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। জমি প্রস্তুতই ছিল, কাজেই অবিলম্বে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। হরদয়ালের পরিচালনায় হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠি ও গুরুমুখী ভাষায় "গদর" নামে একখানি পত্রিকা কালি-ফোর্ণিয়ায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে এই "গদর" পত্রিকাখানিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিল "গদর" দল—যাহাদের লক্ষ্য হইল ভারতে বৃটিশ-শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সোহন সিং ভাখনা, রামচন্দ্র পেশোয়ারী ও বরকতুল্লা প্রভৃতি পরে এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা ও কানাডায় গদর দলের বহু শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ছাড়া জাপান, মালয়, চীন, ফিলিপাইন, ফিজি, আর্জেণ্টাইন ইত্যাদি স্থানসমূহেও গদর দল ছড়াইয়া পড়িয়া একটি জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। বিপদ্ বুঝিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৪

সালের গোড়ার দিকেই হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করিলেন। জামিনে খালাস পাইয়াই হরদয়াল ইউরোপে পলায়ন করিলেন।

ভারত-সরকারের মারফতে কানাডায় এই জবরদস্তিমূলক ইমিগ্রেশন এ্যাক্টের কোনও প্রতিকার হইল না দেখিয়া শিখগণ উত্তেজিত হইয়া নিজেরাই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিখ্যাত কনট্রাক্টর শিখ-নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং।

কোমাগাটামারু

কলিকাতা হইতে একখানি জাহাজ ভাড়া করিবার চেষ্টা করা হইল—কিন্তু জাহাজ পাওয়া গেল না। বাবা গুরুদিৎ সিং তখন হংকং হইতে "কোমাগাটামারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিলেন। ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল হংকং হইতে বহু শিখকে লইয়া জাহাজখানি যাত্রা করিল কানাডার উদ্দেশে।

প্রায় শ'চারেক শিখকে লইয়া কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌছাইতে জাহাজখানির পঞ্চাশ দিন সময় লাগিল। ২৩শে মে তারিখে তাঁহারা উক্ত বন্দরে পৌছাইলেন। কানাডা-সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যাত্রী-দিগকে যথারীতি অবতরণের অনুমতি না দিয়া উপরন্তু জাহাজে একদল পুলিশ পাঠাইয়া দিলেন কানাডা-গভর্ণমেণ্টের আইন মান্য করাইবার জন্য। ইহাতে যাত্রীরা অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গুলি চালাইয়া তাঁহারা পুলিশকে বিদূরিত করিলেন। রণ-তরীর দ্বারা তখন "কোমাগাটামারু"-কে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা হইল এবং বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া না গেলে ভয় দেখান হইল গোলাবর্ষণের।

যাহা হউক, দুই মাস পরে ২৩শে জুলাই তারিখে জাহাজখানি পুনরায়

ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিল। জাহাজখানির প্রত্যাবর্ত্তনের পথেই ইউরোপে প্রথম জগদ্ব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইয়া গেল।

যাত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুনেয়। যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যাঁহারা কানাডা যাইবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এই ব্যর্থতায় তাঁহারা হইয়া উঠিলেন উন্মত্তপ্রায়। তদুপরি সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ অবতরণকামী যাত্রীদের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অবতরণ করিতে না দেওয়ায় ইংরাজদের উপর তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর "কোমাগাটামারু" হুগলী নদীর মোহনায় বজবজে আসিয়া পৌঁছিলে যাত্রীরা শুনিলেন যে তাঁহাদিগকে পুলিশের হেপাজতে সোজা পাঞ্জাবে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ট্রেণ প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে গোলমালের আশঙ্কাতেই গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় রাজি না হইয়া নির্দ্দেশ অমান্য করিযা দল বাঁধিয়া পদব্রজে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। পুলিশ ও সৈন্যগণ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দিল। ইহার ফলে দুইপক্ষে সংঘর্ষ সুরু হইয়া গেল। এই সংঘর্ষের ফলে ১৮ জন শিখ প্রাণ হারাইলেন। পুলিশ ও সৈন্যদের তরফেও কিছু হতাহত হইল। অবশেষে সন্ধ্যাকালে মাত্র ৬০ জন শিখকে জোর-জবরদস্তি করিয়া ট্রেণে চাপান সম্ভব হইয়াছিল। ২৮ জন শিখসহ বাবা গুরুদিৎ সিং কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকার পর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

"কোমাগাটামারু"-কে উপলক্ষ করিয়া এই সকল ঘটনায় পাঞ্জাবে সৃষ্ট হইল দারুণ উত্তেজনা। সংবাদ পাইয়া বিদেশে অবস্থানকারী বহু শিখও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকারী শিখদিগের

প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন তৈয়ারী হইল এবং দেশে ফেরার পরই হাজার হাজার লোককে করা হইল গ্রেপ্তার।

কিন্তু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা তথাপি থামান গেল না। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে পাঞ্জাব বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ১৬ই অক্টোবর চৌকীমান ষ্টেশন হইল লুণ্ঠিত, আর ২৭শে নভেম্বর তারিখে পুলিশ ও বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াই হইল ফিরোজপুর জেলায়। পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় রাসবিহারী, পিংলে, শচীন সান্যাল, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি এই প্রদেশেই তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন।

ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী বিপ্লবীদিগের একটি সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে মহাযুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলকে জীবনপণ-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে নির্দ্দেশ দান করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটি প্রচেষ্টা সুরু হইয়া গেল এবং সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ও সৈন্যগণের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিবার জন্য নানা স্থানে দক্ষ লোক প্রেরিত হইতে লাগিল। রাসবিহারী ও পিংলে লাহোরের ইণ্ডিয়ান হোটেলে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে, পরে তাঁহারা অমৃতসহরে থাকিবেন।

সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লব-প্রচার কার্য্যে কর্ত্তার সিং সারাভা নামে একজন শিখ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেনানীর ছদ্ম-বেশে ব্যারাকে প্রবেশ করিয়া সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব-প্রচার করিতেও তিনি ভীত হইতেন না। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও প্রচারকার্য্যের ফলে লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর ইত্যাদি স্থানের এদেশীয় সৈন্যেরা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কানপুর, জব্বলপুর,

এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানের সৈন্যদের নিকটও বিপ্লবের আহ্বান জানান হইল। সুদূর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্যগণও বিপ্লবের বাণী শুনিতে পাইল।

লাহোর হইল বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল পুরাদমে। বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানীও চলিতে লাগিল। প্রস্তুত হইল বিপ্লবীদের নিজস্ব পতাকা, পোষাক ও প্রতীক চিহ্ন—রচিত হইল যুদ্ধের ঘোষণাপত্র।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করিয়া অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করিয়া দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা বিপ্লবীদিগের ছিল।

কিন্তু বিপ্লবীদের দলে ছিল পুলিশের এক গুপ্তচর—নাম কৃপাল সিং। তাহার নিকট হইতে পুলিশ পূর্ব্বেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয় জানিয়া ফেলিল। রাসবিহারী তখন ২১শের পরিবর্ত্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া সকল কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

তারিখ পরিবর্ত্তনেও কিন্তু সুবিধা হইল না। পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ সহরগুলিতে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতেই খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় সুরু হইল এবং এক স্থানের সৈন্যদের অপর স্থানে সরাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইল। অস্ত্রাগার ও সৈন্যনিবাস প্রভৃতিতে বসান হইল শক্তিশালী প্রহরা। পক্ষকাল যাবৎ পাঞ্জাবে অত্যাচার-উৎপীড়নের আর অন্ত রহিল না। বিপ্লবীদের প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রও পুলিশ হস্তগত করিল।

লাহোরের অবস্থা খারাপ দেখিয়া রাসবিহারী ও পিংলে আবার কাশীতে ফিরিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে পিংলে গেলেন মীরাটে। সেখানে দ্বাদশ ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর থাকিবার ব্যারাকের মধ্যে

মীরাটের সৈন্য-ব্যারাকটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার উপযোগী টিনের বাক্সে রক্ষিত দশটি বোমা সহ তিনি ২৩শে (২৯শে ?) মার্চ্চ তারিখে ধরা পড়িলেন। কর্ত্তার সিং, জগৎরাম প্রভৃতি নেতারাও গ্রেপ্তার হইলেন।

লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা

স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে ইহার পর কয়েক দফায় কয়েকটি ষড়্‌যন্ত্র

বিষ্ণু গণেশ পিংলে

মামলার বিচার হইল। পিংলে, কর্ত্তার সিং, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া যে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে চব্বিশ জন

বিপ্লবীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশ্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ২৪ জনের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত পিংলে, কর্ত্তার সিং, হরনাম সিং এবং আরও চারি জনের ফাঁসি হয় এবং অবশিষ্ট ১৭ জনের প্রাণদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ইহা ব্যতীত আরও অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ড হইল। বিদ্রোহের অভিযোগে দুইটি রেজিমেণ্টের সৈন্যদেরও সামরিক আদালতে বিচার হইয়াছিল।

একজন বিপ্লবীর যে সকল গুণ থাকা দরকার—পিংলের তাহা ছিল এবং সেই জন্যই তিনি ধরা পড়ায় রাসবিহারী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন; পিংলে কার্য্যোপলক্ষে যাইবার পূর্ব্বে যখন রাসবিহারী তাঁহাকে তাঁহার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি নির্ভীকভাবে জানাইয়াছিলেন যে, রাসবিহারীর আদেশ সর্ব্ব সময়ই তাঁহাকে পালন করিতে হইবে; তাহাতে মৃত্যুকে বরণ করিতেও তিনি পশ্চাদ্পদ হইবেন না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ষড়্যন্ত্র মামলায় দীননাথ তলোয়ার রাজসাক্ষী হিসাবে যে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহাতেই রাসবিহারীর নাম সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই হইতেই পুলিশ রাসবিহারীর খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিল এবং রাসবিহারীও আর কার্য্যে যোগদান না করিয়া নানা-স্থানে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বারো হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। দিল্লী, লাহোর এবং বেনারস—এই তিনটি স্থানের ষড়্যন্ত্র মামলাতেই রাসবিহারীকে ধরাইয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

রাসবিহারীর রহস্যময়তা এবং ছদ্মবেশে তাঁহার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো সম্বন্ধে দিল্লী ও লাহোর ষড়্যন্ত্র মামলায় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছিল—

"Rashbehary floats down Lahore into the Presidency of Bengal. He goes down with moustache and comes up clean shaved. He goes down a Punjabi but comes a Bengalee."

রাসবিহারীর ভারত-ত্যাগ

কাশী হইতে রাসবিহারী চন্দননগরে আসেন—সেখান হইতে পরে নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপ হইতে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় ভারতের বাহির হইতে ভারতের বিপ্লবান্দোলনে সহায়তা করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিদেশে পলায়নের একটা সুযোগও এই সময় জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জাপানে যাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। রাসবিহারী "পি, এন, ঠাকুর" ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট জাপানে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নাম দেখিয়া ভাবিলেন যে, তিনি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রার ব্যবস্থা ঠিক করিতেই বোধহয় তিনি জাপানে যাইতেছেন; সুতরাং তাঁহারাও অনুমতি প্রদান করিতে দ্বিধা করিলেন না। এইভাবে শচীন্দ্র সান্যাল এবং গিরিজাবাবু (নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) প্রভৃতির উপর বিপ্লবান্দোলন পরিচালিত করার ভারার্পণ করিয়া এবং সকলকে আন্দোলন চালাইয়া যাইবার পরামর্শ দিয়া ১৯১৫ সালের ১২ই মে "সানুকিমারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজে চাপিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাসবিহারী রাত্রিকালে ভারত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতিও ধরা পড়িলেন। বেনারস ষড়্‌যন্ত্র মামলায় শচীন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ

হইল। গিরিজাবাবুও উক্ত মামলায় দণ্ডিত হইয়া আগ্রা জেলে অবস্থান-কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

স্বাধীনতা-অর্জ্জনে বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টা

গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইউরোপ পলায়নের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হরদয়াল গিয়া জার্ম্মাণীতে উপস্থিত হইলেন। চম্পকরমণ পিলে, ডক্টর তারকনাথ দাস প্রভৃতির চেষ্টায় বার্লিনে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি" গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত হরদয়াল, বরকতুল্লা, হেরম্বলাল গুপ্ত ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীও যোগদান করিলেন। ইঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগবিধানের জন্য। পিল্লাই নামে একটি তামিল যুবক এ সম্বন্ধে বার্লিনে জার্ম্মাণ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতে লাগিলেন।

এশিয়া মহাদেশে বিপ্লবীদের দুইটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল—একটি ব্যাঙ্ককে ও অপরটি বাটাভিয়ায়। ব্যাঙ্ককের কেন্দ্রের সহিত গদর দলের এবং বাটাভিয়ার কেন্দ্রের সহিত বাংলার বিপ্লবীদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ব্রহ্মদেশ ছিল তখন ভারতেরই একটি অংশ এবং ব্রহ্মদেশে শিখ পুলিশ ছিল প্রচুর; সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবার পর বিপ্লবীরা ব্রহ্মের পার্শ্বস্থিত শ্যামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণের একটি পরিকল্পনা ঠিক করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে, এই ব্যাপারে ব্রহ্মস্থিত শিখ পুলিশদের সহায়তা তাঁহারা লাভ করিবেন। ভারতে ও ব্রহ্মে তখন বৃটিশের সামরিক শক্তি দৃঢ় না থাকায় বিপ্লবীরা সাফল্যলাভের আশা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে নানা বৃটিশ-বিরোধী প্রচার-পত্র শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্ত-পথ দিয়া পাঠান হইতে লাগিল। হেরম্বলাল গুপ্ত

জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকায় চলিয়া গেলেন এবং বোয়েম নামক একজন জার্ম্মাণ সেনাপতিকে শ্যামদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ব্রহ্ম-আক্রমণের উপযোগী সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য। আমেরিকার কার্য্য পরিচালনার জন্য পরে হেরম্ব গুপ্তের স্থলে চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জার্ম্মাণ-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত পরবর্ত্তীকালে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ভারত-জার্ম্মাণী ষড়্‌যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই মামলা আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। যাহা হউক, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে গদর দলের বহু সদস্য শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজদের যুদ্ধ ঘোষণায় ইস্‌লাম-স্বার্থ রক্ষাকল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা সিন্ধী প্রভৃতি কাবুলে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। অচিরে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ওবেদুল্লা সিন্ধী, বরকতুল্লা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গদর দল এবং কাবুলের বিপ্লবীদের সহিত হরদয়াল যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বহির্ভারতের বিপ্লবী-দলগুলি ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিয়া বিপ্লবান্দোলনে নানারূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার অজিত সিংহও এই সময় বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। জার্ম্মাণরা কাবুল, আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

বহির্ভারতে ও ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবের প্রস্তুতি এইভাবে চলিতেই লাগিল। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গেলেও তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল না। ২১শে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ সম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও

বার কয়েক যুক্তি-পরামর্শ হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ তখন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী-নেতা।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ) তাঁহার মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল যশোহর জেলার বিসখালি নামক গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া যতীন্দ্রনাথ তাঁহার মাতুলালয়েই লালিত-পালিত হন।

কৃষ্ণনগর এ-ভি স্কুল হইতে ১৮৯৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছুদিন কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়িয়াছিলেন। খেলা-ধূলায় যতীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রচুর এবং নানা শ্রমসাধ্য-কার্য্যে তিনি পটু ছিলেন। একবার তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গেলে তিনি নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার মানসে কুস্তীর আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং নিয়মিত শরীরচর্চ্চার দ্বারা অমিত শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ-রাইটিং শিখিয়া তিনি কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার একটি সাহেবী সওদাগরী অফিসে মাসিক ৫০৲ বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন; ইহার পর তিনি মজঃফরপুরে যান এবং সেখানে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের (যাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হইয়াছিলেন) অধীনে ষ্টেনোগ্রাফার হিসাবে মাসিক ৮০৲ বেতনে কাজ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের ষ্টেনোগ্রাফার হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের ষ্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করিবার সময়

তাঁহাকে কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং উভয় স্থানেই থাকিতে হইত। যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় এই সময় হইতেই। ১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।
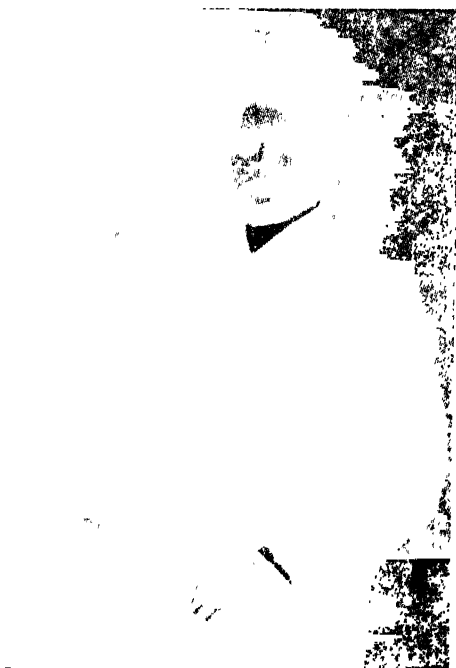
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

যতীন্দ্রনাথের অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ও সাহস ছিল। একবার তিনি যখন দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন, তখন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এক গ্লাস জল লইয়া আসার সময় চারিজন গোরা সৈন্য তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ধাক্কা দেয় এবং ইহার

ফলে তাঁহার হস্তধৃত কাচের গ্লাসটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ যখন তাহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিলেন, তখন একযোগে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনিও বাধ্য হইয়া তখন প্রতিআক্রমণ করিলেন। সৈন্যদের একজন ছুরি বাহির করিয়া হঠাৎ এক সময় তাঁহাকে আঘাত করিয়া বসিল—কিন্তু ইহাতেও তাহারা যতীন্দ্রনাথকে কাবু করিতে পারিল না। বাংলার এই বীর-সন্তান শূন্য হস্তে একাকী লড়াই করিয়াই একে একে তাহাদের চারিজনকেই ধরাশায়ী করিলেন। ইহা লইয়া গোরা চারিজন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পরে আদালতে মামলা রুজু করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করিয়া লয়।

একবার একটি অল্পবয়স্ক বালক পথে খেলা করিবার সময় একটি চানাচুরওয়ালার সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে সকল চানাচুর রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। চানাচুরওয়ালা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেটিকে প্রহার করিয়া আরও নানাবিধ উপায়ে তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। ঘটনাটি অবগত হইয়া তিনি চানাচুরওয়ালাকে বলিলেন ছেলেটিকে ছাড়িয়া দিতে এবং চানাচুরওয়ালার কথামত তাহার চানাচুরের মূল্য পাঁচ টাকা দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। লোকটি তবুও ছেলেটিকে ছাড়িয়া না দিয়া যতীন্দ্রনাথের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। একজন সাহেবও সেই সময় সেখানে আসিয়া চানাচুরওয়ালার পক্ষ লইল। যতীন্দ্রনাথ তখন জোর করিয়া চানাচুরওয়ালাটির নিকট হইতে ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন। সাহেবটি ইহাতে খাপ্পা হইয়া যতীন্দ্রনাথের উপর বল-প্রয়োগের চেষ্টা করিল, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিল যে ঠাঁই বড় কঠিন। যতীন্দ্রনাথ তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন।

কয়াগ্রামের নিকটে একটি গ্রামে একবার বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল।

যতীন্দ্রনাথের মামাতো ভাই বন্দুক লইয়া গিয়াছিলেন বাঘ শিকার করিতে—যতীন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে কেবলমাত্র একখানি ভোজালি ছিল। বাঘটিকে বাহির করিবার জন্য সঙ্গের লোকজন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের জঙ্গলে গিয়া চারিদিকে তাড়া দিতে লাগিল। বাঘটিও তাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল—যতীন্দ্রনাথ যেদিকে ছিলেন সেই দিকেই। তাঁহার মামাতো ভাই বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন, কিন্তু তাহাতে বাঘটি সামান্য আহত হইল মাত্র। গুলির শব্দে ও আঘাতে বাঘটি আরও ক্ষেপিয়া গেল এবং যতীন্দ্রনাথকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। সেই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তেও তিনি সাহস হারাইলেন না। কৌশলে তিনি ব্যাঘ্রের মস্তকটি নিজের বাম বগলে চাপিয়া ধরিলেন এবং ভোজালি দ্বারা উপর্য্যুপরি তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে যতীন্দ্রনাথ পড়িয়া গেলে বাঘটি কামড়াইয়া ও নখ বসাইয়া তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। নিজের গুরুতর আঘাত অগ্রাহ্য করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ কোনওরূপে বাঘটিকে নিহত করিলেন। মৃতপ্রায় যতীন্দ্রনাথকে ইহার পর বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া বহু চিকিৎসায় অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার এই ব্যাঘ্র-নিধন এবং আসাধারণ শৌর্য্য-সাহসের জন্যই তিনি সকলের নিকট "বাঘা যতীন" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব-পন্থার সহিত যতীন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সামশুল আলমকে হত্যার পর বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তাহাতে তিনি জানান যে, হত্যার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথের দ্বারাই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে ১৯১০সালের ২৭শে জানুয়ারি যতীন্দ্রনাথ পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইলেন। মার্চ্চ মাসে যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র

রায়), সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ৫০ জনের বিরুদ্ধে হাওড়া ষড়্যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল।

গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহাদের সকলকে বৎসরাধিককাল জেল হাজতে অসীম দুঃখ-কষ্ট ও নির্য্যাতনের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এই সময় যতীন্দ্রনাথের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া ভয় দেখাইয়া স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করিত। একদিন একজন ফিরিঙ্গী পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার স্বীকারোক্তি লাভের আশায় তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইল,—"You will get fine girls and best wines." ইহা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ তাহাকে থামিতে বলিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে ক্রোধে এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে টেবিলটির নাকি কিয়দংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে পুলিশের স্বীকারোক্তি আদায়ের উৎসাহ কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

এই কঠোরতার মধ্যেও কিন্তু স্নেহপ্রবণ যতীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার কাছে কেহ কিছু বলিতে আসিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। বীরেন্দ্রনাথের কথা তাঁহার মনে পড়িলেই তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পরিণামে হাওড়া ষড়্যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই মুক্তিলাভ করেন (এপ্রিল, ১৯১১)।

যতীন্দ্রনাথ মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সরকারী চাকুরী আর রহিল না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তখন তাঁহাকে কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্য্যের সংশ্রবে তাঁহাকে নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। পুলিশের গুপ্তচরগণ প্রায়ই ঘুরিত তাঁহার পিছনে পিছনে, কিন্তু তথাপি এই ভ্রমণ উপলক্ষে

বিভিন্ন স্থানে নানা ব্যক্তি ও সভা-সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া নানা কার্য্যে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর গুলিতে এই সময় একদিন এক গুপ্তচর আহত হইল।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান আসামী। বিভিন্ন বিপ্লবী-দলের সদস্যেরা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এই মামলাতে। যতীন্দ্রনাথ প্রধান আসামীরূপে স্থাপিত হওয়ায় এবং তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্য দলভুক্ত বিপ্লবীরাও স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে নেতারূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। মামলা হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই কারণেই প্রায় সকল বিপ্লবীদলই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ক্রমশঃ একত্রিত হইল। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য নেতা বাংলাদেশে তখন আর কেহ ছিলেন না। ইহা ব্যতীত ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যা উপলক্ষে যে সেবাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও বিভিন্ন বিপ্লবী-দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সকলেরই পারস্পরিক সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদের একত্রিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। পরবর্ত্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিপ্লবীদের এই সহযোগিতার মনোভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর বাংলাদেশে গুপ্ত আন্দোলন পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার নিদর্শন মিলিতেও বিশেষ বিলম্ব হইল না। ৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গোলদীঘির পার্শ্বে তিনজন বিপ্লবীর দ্বারা হেড কনষ্টেবল হরিপদ দে গুলির আঘাতে নিহত হইল। এই মাসেই ইন্স্পেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহে প্রাণ দিলেন বোমার আঘাতে।

২৯৬-১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত হইত সিগারেটের টিনে। পুলিশ উক্ত বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া বিপ্লব-বিষয়ক নানা কাগজপত্র ও বোমা তৈয়ারীর টিন হস্তগত করে। রক্তপাত ও হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার নির্দ্দেশমূলক একটি লিখিত কাগজও পাওয়া যায়। তল্লাসীর ফলে শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা এবং আরও তিনজন বিপ্লবী ধৃত হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১৯১৩ সালে রাজাবাজার বোমার মামলা আরম্ভ হয় এবং বিচারে শশাঙ্কের প্রতি আদেশ হয় ১৫ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডের। রাজাবাজারে প্রস্তুত বোমার ন্যায় বোমা মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানসমূহেও ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

১৯১৪ সালের ১৯শে জানুয়ারি গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে ট্রাম হইতে অবতরণের সময় প্রাণ হারাইলেন নির্ম্মলকান্ত রায় ও অপর এক ব্যক্তির রিভলবারের গুলিতে। অনন্ত তেলী নামে একটি ছোট ছেলে পলায়ন কালে নির্ম্মলকান্তের চাদর ধরিয়া ফেলিয়াছিল। বাধ্য হইয়া নির্ম্মলকান্ত গুলি চালাইয়া তাহাকে নিহত করেন। হাইকোর্টে নির্ম্মলকান্তের দুইবার বিচার হয় এবং অধিকাংশ জুরির মতে দুইবারই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া নির্ম্মলকান্ত মুক্তি পান। অপর ব্যক্তিকে ধরা সম্ভব হয় নাই, নৃপেন্দ্র ঘোষকে নিহত করিয়াই সে পলায়ন করিয়াছিল। এই সালেই কতকগুলি স্বদেশী ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হয়—বৈদ্যবাটী, আড়িয়াদহ, বরাহনগর ও আলমবাজারে।

রড্ডা কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি

রড্ডা কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি এই সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট উক্ত কোম্পানীর কতকগুলি বাক্স

বোঝাই পিস্তল ও গুলি-বারুদ আসিয়া পৌছাইল Tactician নামক একখানি জাহাজে। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী শ্রীশচন্দ্র সরকার কাষ্টমস্ হাউস হইতে মালগুলি ছাড় করাইয়া আনিবার জন্য কোম্পানীর দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২০২ বাক্স অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ খালাস করিয়া চারিটি গোরুর গাড়ীতে তাহা বোঝাই করা হয় এবং তিনটি গোরুর গাড়ীতে মোট ১৯২ বাক্স মাল উক্ত কোম্পানীর গুদামে জমা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ১০ বাক্স অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ বোঝাই গাড়ীটি লইয়া শ্রীশবাবু ২৮শে অক্টোবর নিরুদ্দিষ্ট হন। ঐ ১০টি বাক্সে ৫০টি বড় মশার পিস্তল ও প্রায় ৪৬,০০০ রাউণ্ড বুলেট ছিল। গাড়ীটিকে প্রথমতঃ মলঙ্গা লেন ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের কাছে লইয়া আসা হয়, পরে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে বাক্সগুলি বোঝাই করিয়া বহুবাজারের জেলেপাড়ায় লইয়া গিয়া বাক্সগুলি খালাস করা হয়। মলঙ্গা লেনের* অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বহুবাজারের গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা এই পিস্তল চুরি ব্যাপারের সহিত জড়িত ছিলেন। বাংলার নানাস্থানের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এই সকল পিস্তল ও গুলি-বারুদ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতাগণ এই পিস্তল-বণ্টন ব্যাপারের তদ্বির করিয়াছিলেন।

অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের দ্বারা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুসলমান-পাড়া লেনস্থ বাসভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বসন্তবাবু অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়া যান এবং বোমানিক্ষেপকারীদেরই কয়েকজন ইহাতে আহত হন। ইহার পূর্ব্বে ঢাকায় থাকিতে আর একবার তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয়

বিপ্লবীরা ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে বহির্ভারত হইতেও তাঁহারা সাহায্য পাইতেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা এই সময় একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যতীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ করিলেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপিত হইল এবং বিদেশ হইতে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যতীত এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে, তাই চারিদিকে আবার স্বদেশী-ডাকাতি আরম্ভ হইয়া গেল। ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার প্রাগপুরে এবং হাওড়ার শিবপুরে দুইটি এইরূপ ডাকাতি হইল। এই বৎসরই ১২ই জানুয়ারি তারিখে বার্ড কোম্পানীর একজন দরোয়ান যখন টাকা লইয়া গার্ডেন রীচে উক্ত কোম্পানীর মিলে যাইতেছিল, তখন তাহার নিকট হইতে ১৮,০০০৲ টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। যতীন্দ্রনাথ ও বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশেই গার্ডেন রীচের ডাকাতি হইয়াছিল।

১৯১৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবীরা স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বেলিয়াঘাটার এক চাউল-ব্যবসায়ীর কেসিয়ারের নিকট হইতে ২২,০০০৲ টাকা লুট করিয়া আনেন। যে ট্যাক্সিতে চাপিয়া তাঁহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন, ডাকাতির পর সেই ট্যাক্সির চালক বিপ্লবীদের কথামত চলিতে অস্বীকার করে। তাহাকে তখন গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ভারতীয় বিদ্রোহে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবার জন্য

জার্ম্মাণী খুবই উৎসুক। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বেই যতীন্দ্রনাথের দ্বারা ব্যাঙ্ককে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাটাভিয়াস্থিত জার্ম্মাণদের সহিত কর্ম্মপন্থা স্থির করিবার জন্য বিপ্লবীদের তরফ হইতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এপ্রিল মাসে তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া নরেন্দ্রনাথ ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন মিঃ সি, মার্টিন। অবনী মুখোপাধ্যায়কেও জাপানে পাঠান হইল।

মেভারিক

থিয়োডোর হেলফারিক নামক একজন জার্ম্মাণ বাটাভিয়ায় নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে জানাইলেন যে, "মেভারিক" নামক একখানি জাহাজযোগে ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে ত্রিশ হাজার রাইফেল, বহু গুলি-বারুদ এবং দুই লক্ষ টাকা ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য করাচী বন্দরে যাইতেছে। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে সাংহাইস্থিত জার্ম্মাণ-রাজদূতের সহিত পরামর্শের পর উক্ত জাহাজখানি বাংলায় আনা স্থির হইল। সেই অনুযায়ী জাহাজখানি হনলুলু হইতে বাংলার পথে জাভায় চলিল। স্থির হইয়াছিল যে, সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে "মেভারিক" জাহাজের মাল খালাস করা হইবে। সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য জুন মাসে বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীরা পরামর্শ করিয়া "মেভারিক" জাহাজের মাল তিন স্থলে ভাগ করিয়া লইবার পরিকল্পনা রচনা করিলেন। তদনুযায়ী হাতিয়া, কলিকাতা এবং বালেশ্বর—এই তিন স্থানে অস্ত্র-শস্ত্র ভাগ করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বাংলার বিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কলিকাতায় আসিবার

তিনটি প্রধান রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্থির হইল যে, বালেশ্বরে থাকিয়া সহকর্ম্মিগণসহ স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ রেলপথ এবং চক্রধরপুরে থাকিয়া সহকর্ম্মিগণসহ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এন, রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন; আর অজয় নদের উপর ই, আই, রেল-পথের সেতু বিধ্বস্ত করিয়া দিবার ভার পড়িল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর। ফণি চক্রবর্ত্তী ও নরেন্দ্র চৌধুরীকে হাতিয়ায় পাঠান হইল। তাঁহাদের উপর ভার রহিল বিপ্লবীদের সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলি অধিকার করিয়া কলিকাতার সহিত সংযোগ-স্থাপনের। "মেভারিক" জাহাজে আগত জার্ম্মাণ অফিসারগণ পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবীদিগকে শিক্ষাদান করিবেন বলিয়া ঠিক হইল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইল কলিকাতার নেতৃত্ব। কলিকাতার সকল অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দখল এবং ইংরাজ-সৈন্য প্রভৃতিকে পর্য্যুদস্ত করিবার ভার তাঁহাদের উপর রহিল।

কথা ছিল যে, রায়মঙ্গলের নিকট রাত্রিকালে "মেভারিক" জাহাজ আসিয়া পৌছাইবে এবং জাহাজে খাড়াভাবে সারি সারি আলো জ্বলিতে দেখিয়া বিপ্লবীরা বুঝিয়া লইবে যে, উহাই "মেভারিক" জাহাজ। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনায় রায়মঙ্গলের নিকটস্থ এক জমিদার জাহাজ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র নামাইবার জন্য লোকজন ও যান-বাহন দিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। অতুল ঘোষ নৌকা করিয়া রায়মঙ্গলের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন মাল খালাসের জন্য; কিন্তু দশদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়াও নির্দ্দিষ্ট জাহাজের সাক্ষাৎ মিলিল না। জুন মাসের মধ্যে যে জাহাজের আসিয়া পৌছিবার কথা—জুন মাস শেষ হইয়া গেলেও তাহা আসিয়া পৌছিল না।

এই বিলম্বে বিপ্লবীরা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে

একজন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক শিখ বিপ্লবীর নিকট হইতে সংবাদ আনিলেন, শ্যামদেশস্থ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত কর্ত্তৃক নৌকাযোগে পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বারুদ ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে প্রেরিত হইয়াছে। বিপ্লবীরা ভাবিলেন যে, "মেভারিক" জাহাজের অস্ত্র-শস্ত্রের পরিবর্ত্তেই বুঝি ঐ নৌকার অস্ত্র-শস্ত্র পাঠান হইয়াছে। সেই জন্য অস্ত্রাদি প্রেরণ সম্পর্কে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম যাহাতে না করা হয়, তাহা হেলফারিককে জানাইবার জন্য ঐ বাঙ্গালীটি আবার বাটাভিয়া হইয়া ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া গেলেন। অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র যাহা পাঠান হইবে— তাহা হাতিয়া, সন্দীপ ও বালেশ্বরে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইল।

যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই পূর্ব্বপরিকল্পনামত বালেশ্বরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার অপর চারিজন সঙ্গী—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল।

নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জন-চিত্তপ্রিয়

চিত্তপ্রিয়ের বাড়ী ছিল খালিয়া গ্রামে এবং নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের বাড়ী খৈয়ারভাঙ্গা গ্রামে। তাঁহারা তিনজনেই ছিলেন মাদারীপুর স্কুলের ছাত্র। খৈয়ারভাঙ্গার মাইল পাঁচেক দূরেই ছিল বিপ্লবী পূর্ণ দাসের জন্মস্থান এবং চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন তিনজনেই ছিলেন পূর্ণ দাসের দলের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি ডাকাতি উপলক্ষে পুলিশ ১৯১৩ সালে নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয়, পূর্ণ দাস, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর ষড়্যন্ত্র মামলা রুজু করে, কিন্তু মাস আষ্টেক মামলা চালাইবার পর মামলা তুলিয়া লয়। মুক্তি পাইবার পর চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের মাদারীপুর স্কুলে আর প্রবেশানুমতি মিলে নাই। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসেন

এবং অতি কষ্টে চিত্তপ্রিয় কেশব একাডেমিতে ও নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ইন্‌সটিটিউসনে ভর্ত্তি হন। পুলিশ কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদের পশ্চাতে লাগিয়া রহিল।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকল বিপ্লবীদল সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পর পূর্ণ দাস— চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনকে যতীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। বেলেঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতিতে নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন অংশ গ্রহণ করেন। গার্ডেন রীচ ডাকাতিতেও তাঁহাদের কেহ কেহ জড়িত ছিলেন।

গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্ম্মচারী-হত্যার সংস্রবে পুলিশ চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের পুনরায় খোঁজ করিতে থাকায় তাঁহারা তিনজনে গুপ্ত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। চিত্তপ্রিয়ের নামে ছিল হত্যার অভিযোগ। আই, বি, ইন্‌সপেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বিপ্লবীরা এই সময় অতিশয় অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। নানা কারণে যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হত্যার আদেশ দেন। বিপ্লবীরা বহুবার তাঁহাকে হত্যার চেষ্টাও করেন— কিন্তু বিফল হন। ইহাতে যতীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন এবং একদিন সঙ্কল্প করেন যে সেইদিনই তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সংবাদ না পাইলে আর জলগ্রহণ করিবেন না। তাঁহার এই সঙ্কল্পে বিপ্লবীরা বিচলিত হইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে হত্যার অভিপ্রায়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বিপ্লবীরা সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বড়লাটের আগমন উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় সেইদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তখন চিত্তপ্রিয় হেদোর নিকট কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর প্রকাশ্য স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন এবং নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন অপেক্ষারত রহিলেন একটু দূরেই। তাঁহাদের

আশা ছিল যে, হত্যার অভিযোগ যাঁহার নামে আছে, চিত্তপ্রিয়ের মত সেইরূপ একজন আসামীকে সম্মুখে দেখিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার প্রলোভন সুরেশ মুখোপাধ্যায় সহজে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তখন প্রলুব্ধ হইয়া তিনি সেখানে থামিলে তাঁহারা তিনজনে তাঁহাকে নিহত করিবেন।
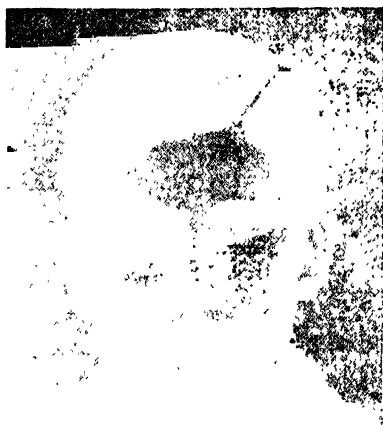
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

সত্যই শিকার ফাঁদে পড়িল। চিত্তপ্রিয়কে দেখিতে পাইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন: যে, তিনি চিত্তপ্রিয় কিনা। চিত্তপ্রিয়ের মুখে "হাঁ" উত্তর পাইয়া সুরেশ

মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ধরিতে যাইতেই চিত্তপ্রিয়ের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কিন্তু গুলি করিবার পূর্ব্বেই সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন নিকট হইতে মনোরঞ্জনও গুলি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে সুরেশচন্দ্র ভূতলশায়ী হইলেন। চিত্তপ্রিয়ের নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় গুলিতে সুরেশচন্দ্রের বক্ষ বিদ্ধ হইল। এইভাবে একটি জনবহুল রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গী জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী ভয়ে ডাষ্টবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বক্ষশোণিতে পিস্তলের মুখ রঞ্জিত করিয়া লইয়া শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিপ্লবী তিনজন পলায়ন করিলেন এবং যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত-গৃহে উপস্থিত হইয়া সাফল্যের সংবাদ ঘোষণা করিলেন।

বেলিয়াঘাটা ট্যাক্সি-ডাকাতির পর পাথুরিয়াঘাটায় একটি বাড়ীতে সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ যখন অবস্থান করিতেছিলেন—তখন নীরদ হালদার নামক একজন গোয়েন্দা বাড়ীটির সন্ধান পাইল। ১৯১৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সে যতীন্দ্রনাথের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাড়ীটির ভিতরে প্রবেশ করিল। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন শায়িত অবস্থায় এবং তাঁহার পার্শ্বে দুইজন সঙ্গী উপবিষ্ট ছিলেন। নীরদ হালদারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যতীন্দ্রনাথ তাহাকে গুলি করিবার আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তদ্দণ্ডেই পালিত হইল। ইহার পর জিনিষ-পত্র লইয়া অতি দ্রুত সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নীরদ হালদারের কিন্তু তখনও মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে সে যতীন্দ্রনাথের নাম বলিয়া যায় এবং তাঁহার সঙ্গীদের চেহারার বর্ণনা দেয়। তাহা হইতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ঘটনার সময় চিত্তপ্রিয় ও

নীরেন্দ্রই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন এবং নীরদ হালদার সম্ভবতঃ নীরেন্দ্রের গুলিতেই নিহত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর যতীন্দ্রনাথের কলিকাতা ত্যাগ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ

নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

করা হইলে তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার অপরাপর সঙ্গীদেরও কলিকাতা ত্যাগের ও নিরাপত্তার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে না জানিতে পারিলে তিনি যাইতে পারিবেন না। ইহারই কয়েকদিন পরে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ব্বকথিত চারিজন সঙ্গীসহ বালেশ্বরে গিয়া

আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বরের পথে তিনি মেদিনীপুরের এখানে-ওখানেও কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পুলিশ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহও করিল। তাহারা জানিতে পারিল যে, যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও অতুল ঘোষ "শ্রমজীবী-সমবায়" নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রালয়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদার নামক দুইজন মালিকের সহিত তাঁহাদের দোকানে বহু পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র রাখিবার জন্য আলোচনা চালাইতেছেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজ হইতে অস্ত্রাদি নামাইবার ব্যবস্থার বিষয়ও জুলাই মাসে পুলিশ জানিয়া ফেলিল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বিত হইল। "মেভারিক" জাহাজ শেষ পর্য্যন্ত আর আসিয়া পৌছায় নাই। মাল-পত্র না লইয়াই জাহাজখানি ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে বাহির হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, "অ্যানি লার্সেন" নামক আর একখানি জাহাজ হইতে পথিমধ্যে অস্ত্রাদি তুলিয়া লইয়া উহা বাংলায় আসিবে; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক "অ্যানি লার্সেন" ধৃত ও উহার অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত হয়; ইহার ফলে "মেভারিক" জাহাজও আর আসিতে পারে নাই। হেলফারিকের নিকট হইতে পুনরায় সংবাদ পাওয়া যায়—পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বারুদ ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু পুলিশ ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া রীতিমত ধর-পাকড় আরম্ভ করিয়া দিল। বাংলার অবস্থা জ্ঞাত করাইয়া হেলফারিককেও সাবধান করিয়া দিবার জন্য বোম্বাই হইতে বিপ্লবীরা তারে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার নিকট। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিবার মানসে অপর একজন সঙ্গীসহ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া যাত্রা করিলেন।

ইহার পর সাংহাইস্থিত জার্ম্মাণ কন্সাল জেনারল কর্ত্তৃক আরও দুইখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ রায়মঙ্গল (হাতিয়া ?) ও বালেশ্বরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় —কিন্তু তাহাও শেষ পর্য্যন্ত আসে নাই। "হেনরী এস." নামক আর একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া ম্যানিলা হইতে ভারতে যাত্রার পূর্ব্বেই ধৃত হয়। দুইজন চীনাম্যান কাঠের তক্তার মধ্যে গোপনে কতক-গুলি পিস্তল ও বহু গুলি-বারুদ লইয়া আসিতেছিল "শ্রমজীবী-সমবায়"-এর অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবার জন্য। নীলসেন নামক একজন জার্ম্মাণের নির্দ্দেশেই তাহারা এই কাজ করিতে-ছিল। সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল পুলিশের দ্বারা ধৃত হওয়ায় তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দননগরে পলাইয়া যান। রাসবিহারী বসু ও অবিনাশচন্দ্র রায় তখন নীলসেনের বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইবার বহু চেষ্টা করিয়াও পাঠাইতে পারেন নাই। যে অবনী মুখোপাধ্যায়কে জাপানে পাঠান হইয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুরে ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যও আমেরিকায় "মেভারিক" জাহাজযোগে পলাইয়া যাইবার পর ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া গমন করিলে তাঁহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর একজন যুবক পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া হইতে তারে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে পুণা জেলে ভোলানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মহানদী যেখানে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, বালেশ্বরের সেই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে জাহাজের প্রতীক্ষায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারি-জন সঙ্গীসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের সন্ধানে পুলিশ তখন চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছিল। মার্চ্চ মাসের

শেষাশেষি পুলিশ জানিতে পারিল যে, বালেশ্বরের কোনও স্থানে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন।

ভারত-জার্ম্মাণী ষড়্‌যন্ত্রের তথ্যাদি পুলিশ যাহা জানিতে পারে, তাহার ফলে ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিপ্লবীদের আড্ডা "হ্যারি এণ্ড সন্স" নামক দোকানটিতে খানা-তল্লাস হয় এবং কলিকাতার একজন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার বালেশ্বরে গিয়া সেখানে ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়াম" নামক "হ্যারি এণ্ড সন্সের" একটি শাখা অফিসেও ৪ঠা সেপ্টেম্বর তল্লাসী করেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙ্গালী যুবকও ধৃত হয়। তাহার নিকট পুলিশ সংবাদ পায় যে, ময়ূরভঞ্জের নিকটস্থ পার্ব্বত্য জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবি কলিকাতার দুইজন পুলিশ অফিসার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ডকে সঙ্গে লইয়া ময়ূরভঞ্জের মহুলদিয়াতে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উপস্থিত হইলেন।

লোকের নিকট হইতে জানা গেল যে, কয়েকজন বাহিরের লোক কিছুদিন হইতে ঐ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। একজন লোককে সঙ্গে লইয়া তখন সেই বাহিরের লোকদের আস্তানার দিকে পুলিশ অগ্রসর হইল। এক বস্তীর সংলগ্ন একখানি ঘর দূর হইতে দেখাইয়া পথপ্রদর্শনকারী লোকটি এক সময় থামিয়া পড়িল। পুলিশ সাবধানে অগ্রসর হইয়া দেখিল কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বহু তোড়জোড় করিয়া অস্ত্র উঁচাইয়া পুলিশ বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিলেও দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধই রহিল। তখন দরজা খুলিবার সামান্য চেষ্টা করিতেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখা গেল—ভিতরে কেহ নাই। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পুলিশ কাপ্তিপদার জঙ্গলে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে চলিল।

গভীর রাত্রিতে যতীন্দ্রনাথ লোক মারফত সংবাদ পাইলেন, তিনজন

সাহেব হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার কুটীর হইতে কাপ্তিপদার দিকে গিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গী চতুষ্টয় সকলেই একই স্থানে থাকিতেন না। তিনজন থাকিতেন মহুলদিয়ায় ও দুইজন থাকিতেন প্রায় বারো মাইল দূরবর্ত্তী তালবাঁধ নামক স্থানে। কাপ্তিপদা বালেশ্বর হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যতীন্দ্রনাথ রাত্রিকালেই সংবাদ দিয়া তালবাঁধে লোক পাঠাইয়া কুটীর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইবেন—তাহাও তিনি লোক মারফত বলিয়া পাঠাইলেন।

কাপ্তিপদায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি তল্লাস করিয়া পুলিশ সুন্দরবনের একখানি মানচিত্র এবং পেনাং হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রের কাটিং পায়। উক্ত কাটিং-এ "মেভারিক" জাহাজের খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ৮ই তারিখ সারা দিন ও রাত্রি তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া খাদ্য-গ্রহণের আশায় একটি দোকানে উপস্থিত হইলে সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিল যে, সেই অঞ্চলে তৎকালে অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলির সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে, সুতরাং অবিলম্বে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। যতীন্দ্রনাথের দল আত্মপক্ষ সমর্থনে জানাইলেন, তাঁহারা শিকারী এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা অনেকেই বিশ্বাস করিল না। দূরে দূরে থাকিয়া একদল লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

জনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরঞ্জন বন্দুক ছুঁড়িলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে একজন আহত হইল।

ইহার ফলে লোকের সন্দেহ গেল আরও বাড়িয়া এবং মধ্যে অধিকতর ব্যবধান রাখিয়া তাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতিষ পাল সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় স্থানান্তরে পলায়নও আর সহজ হইল না। তখন নিরুপায় বাঘা যতীন সম্মুখ-সমরের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদী-তীরে চাষাখন্দ নামক স্থানে পরিখা খনন করিয়া অতি দ্রুত রণক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

চাষাখন্দ-এর সংগ্রাম

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যগণ লইয়া জঙ্গল ঘেরাও করিয়া ভীষণভাবে আক্রমণ সুরু করিলেন। উভয়পক্ষেই গুলি-বিনিময় চলিতে লাগিল। একদিকে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য —আর অপরদিকে সামান্যমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচটি বাঙ্গালী বীর যোদ্ধা! যুদ্ধ চলিল শক্তিশালী ও দুর্ব্বলে—কিন্তু বিক্রমে পাঁচজনই তিন শতের সমকক্ষ হইলেন।

ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ই একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্র-নাথের উরুদেশে বিদ্ধ হইল; তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াই সমান তেজে লড়াই চালাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্তপ্রিয় সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলে আর একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের পেটে বিদ্ধ হইল। গুরুতর আঘাতে তিনিও আহত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সাদা রুমাল উড়াইবার নির্দ্দেশ দিলেন। নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন ইহাতে মৃদু আপত্তি জানাইলেন —এইভাবে আত্মসমর্পণের তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু অবশিষ্ট

অমূল্য জীবনগুলিকে বৃথা মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে যতীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক হইলেন। গম্ভীরকণ্ঠে তিনি জানাইয়া দিলেন—উহাই তাঁহাদের নেতার আদেশ, সুতরাং তাঁহাদিগকে উহা মান্য করিতেই হইবে। অগত্যা বাধ্য
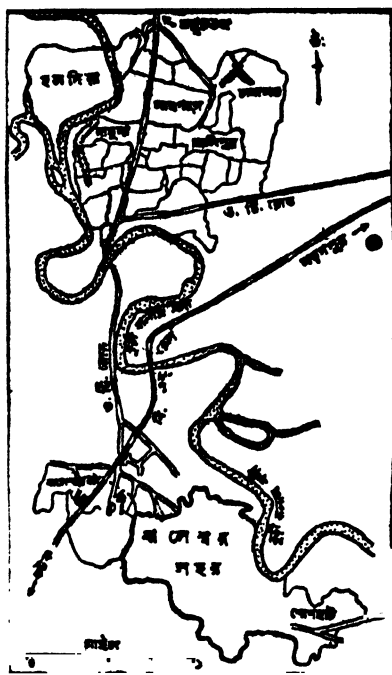
চাষাখন্দের রণক্ষেত্র

হইয়া তাঁহাদিগকে সাদা নিশান উর্দ্ধে তুলিতে হইল। সমাপ্ত হইল চাষাখন্দের সংগ্রাম।

চিত্তপ্রিয় রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আহত অবস্থায়

যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ গ্রেপ্তার হইলেন।

হাসপাতালে নীত হইয়া যতীন্দ্রনাথ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টেগার্ট সাহেব স্বয়ং একগ্লাস জল লইয়া যতীন্দ্রনাথকে দিতে গেলেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উহা পান করিলেন না। যাঁহার রক্তে তিনি চাহিয়াছিলেন নিহত বিপ্লবীদিগের তর্পণ করিতে—তাঁহার দেওয়া জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

জীবিত সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, সকল কিছুর জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। বাঙ্গালীদের জন্য তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন,—"Tell the people of Bengal that Chittapriya Rai and I sacrificed our lives in vindicating the honour of Bengal."

স্বয়ং টেগার্ট সাহেবও এই অধীন দেশের ঐ অসমসাহসী তেজস্বী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; তাই পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন,—"I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench."

বালেশ্বরের হাসপাতালে আহত অবস্থায় আনীত হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পরেই যতীন্দ্রনাথের দেহাবসান হয়। বিচারে নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির আদেশ হইল এবং সেই আদেশ কার্য্যকরী করা হইল কটক জেলে। জ্যোতিষের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। আন্দামানে গিয়া পীড়নে ও পরিশ্রমে জ্যোতিষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে পুনরায় এদেশে আনা হয়। পরবর্ত্তীকালে বহরমপুর (মতান্তরে রংপুর) জেলে

থাকাকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নদীয়া জেলার খোকসা গ্রামে জ্যোতিষের বাড়ী ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বাংলার পাঁচটি বীর সন্তানের ইহাই অতুলনীয় অবদান। বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ —এই হীন প্রচারণার বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁহারা বুড়ীবালামের তীরে চাষাখন্দ-রণক্ষেত্রে চিরকালের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহা অনন্তকাল ধরিয়া জাতিকে যোগাইবে দুর্জ্জয় সাহস এবং প্রেরণা। তাঁহাদের অক্ষয় স্মৃতি জাতির নিকট হইয়া থাকিবে চিরন্তন অমূল্য সম্পদ্।

যাহা হউক, ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইল আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। পুলিশ সাব্-ইন্‌সপেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় নিহত হইলেন এবং আর একজন হইল আহত। ময়মনসিংহে পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ও তাঁহার পুত্র প্রাণ হারাইলেন।

১৯১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারি গোয়েন্দা দারোগা মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে বেলা দশটার সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এই সালের ৩০শে জুন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—যাঁহাকে পূর্ব্বে দুইবার হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছিল—আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দেন। তাঁহার আর্দ্দালীও আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পর পুলিশের তৎপরতা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং বহু বিপ্লবী ধৃত হইলেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু ষড়্‌যন্ত্র মামলার উদ্ভবও এই সময়েই হইয়াছিল।

গৌহাটীর লড়াই

১৯১৬-১৭ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের দমননীতি যখন চরমে উঠিল, তখন বিপ্লবীদের পক্ষে বাংলায় অবস্থান আর সম্ভব হইল না। যে সকল বিপ্লবী-নেতা তখনও ধৃত হন নাই, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, বাংলার বাহিরের কোনও কেন্দ্র হইতে গুপ্ত-আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে। তদনুযায়ী গৌহাটীতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল এবং সেখান হইতেই বিপ্লবীরা কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। পুলিশ খবর পাইয়া একদিন সেই আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা সুকৌশলে সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। পুলিশ সেখানেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের বাধিয়া গেল একটি খণ্ডযুদ্ধ। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন বিপ্লবী ব্যতীত প্রায় সকল বিপ্লবীই ধৃত হইলেন। যে দুইজন তখন পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নলিনী বাগ্‌চী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত। প্রবোধ পরে ধরা পড়িয়াছিলেন। নলিনী কলিকাতায় আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলেন। পুলিশের গুলিতে ঢাকায় পরবর্ত্তীকালে নলিনী প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

রেশ্‌মী চিঠি:

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুর্ক-ইতালী যুদ্ধের সময় তুরস্কের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ ও ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণের এক

পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল এবং উক্ত অভিযানে ভারতীয়গণেরও সাহায্য-লাভের আশা করা হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যেই মৌলনা ওবেদুল্লা সিন্ধী কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাবুলে যে তুর্ক-জার্ম্মাণ মিশন আসিয়াছিল—উহার সহিত তাঁহাদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। হেজাজের তুর্কী সামরিক গবর্ণর গালিব পাশাও এই আলোচনায় যোগদান করেন। স্থির হয় যে, বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন ১৯১৪ সালের শেষের দিকে। তিনি ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সহিত জেনেভায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে কাইজারের সহিতও তিনি আলাপ করিয়াছিলেন। কাবুলে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখিত চিঠি-পত্রাদির কতকগুলি কোনওপ্রকারে বৃটিশের হস্তগত হয়। পত্রগুলি ছিল হরিদ্রাবর্ণের রেশ্‌মী কাপড়ের উপর লিখিত। সেই জন্যই এই ষড়্‌যন্ত্রকে "রেশ্‌মী চিঠি-ষড়্‌যন্ত্র" বলা হইয়া থাকে। এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় ১৯১৬ সালে ফাঁস হইয়া যায় এবং এই সালের জুন মাসে ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান নেতা মক্কার শেরীফ তুর্কীদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই ভারতীয় বিপ্লব-আন্দোলনেরও প্রথম পর্য্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হয়। ইহার পর ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে এক নূতন

যুগের প্রবর্ত্তন হয় এবং গুপ্ত-আন্দোলন ভারতব্যাপী এক প্রকাশ্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। গান্ধীজীর অসীম প্রভাবে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিপ্লবান্দোলন স্থগিত থাকে এবং ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ-আন্দোলন ব্যর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে উহার আর পুনরাবির্ভাব ঘটে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনগণের মানসিক ভাবধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—তাহারই পটভূমিকায় ভারতের যাবতীয় যুদ্ধোত্তর আন্দোলন বিচার করিতে হইবে; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে উহা আলোচনার যোগ্য।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।